বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫৯

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড
পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক—ফাইন আর্ট টেম্পল

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু' টাকা

উৎসর্গ

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু—

কত কালের কথা—হয়তো মনে পড়বে না। সঙ্কুচিত এক নবীন লেখকের প্রথম লেখা পড়েই মুহূর্তে তাকে আপনার করে নিলে। আজকের প্রবীণ লেখক সকৌতুকে পিছনে চেয়ে সেই সব দিন ভাবছে।

মনোজ বসু
১লা পৌষ, ১৩৫২

কান পেতে আছে অমরেশ। ঘরের মধ্যে কাতরানি।

হল কি?

মনোরমা বেরিয়ে এসে ঝঙ্কার দেয়, কেন বিরক্ত করছেন বলুন তো? কাজ করতে দেবেন না?

বেকুব হয়ে অমরেশ বলে, মানে...বারান্ডা দিয়ে যাচ্ছিলাম, কি রকম করে উঠল যেন হঠাৎ—

অমন ঢের ঢের করে থাকে। যান।

তার পর সুর নরম করে বলে, এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম— এমন ভয়তরাসে মানুষ দেখিনি বাপু—

ভয় নেই তো?

না গো মশায়, না। সব মায়ের এই রকম হয়ে থাকে। আপনার মায়েরও হয়েছিল। সৃষ্টির গোড়া থেকে হয়ে আসছে। ভয় আবার কিসের?

অমরেশের মুখের দিকে চেয়ে করুণাপরবশ হয়ে বলল, আচ্ছা, দেখে যান একবারটি না হয়—

রেবার ফর্শা রং রক্তশূন্যতায় সাদা হয়ে গেছে। কাপড়-চোপড় সামলে নিয়ে একটুখানি ম্লান হেসে সে বলল, খাওয়া-দাওয়া করো নি তুমি?

অমরেশ বলে, হুঁ—

কক্ষণো না। রুক্ষ চুল, শুকনো চেহারা—যাও, পাগলামি কোরো না, খাও-দাও গিয়ে।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে রেবা?

রেবা তাকাল মনোরমার দিকে। ইতস্তত করছে আর এক জনের

সামনে জবাব দিতে। এই অবস্থায় দ্বিধা করা সাজে না। সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে বলে, কিসের কষ্ট? মা হওয়া কি যে-সে কথা? সে তুমি বুঝবে না। অনেক ভাগ্যে স্বামীর হাতে ছেলে তুলে দেওয়া যায়। যাও, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে নাও গে একটু। নইলে সত্যি আমার কষ্ট হবে।

আর এক মেয়ে জয়ন্তী।

মাথা খারাপ করে দেয় বিচ্ছুগুলো। এ বাড়িতে আর চলবে না মামীমা—

নবদুর্গা সভয়ে বলে, বলছ কি তুমি?

বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। এত হুল্লোড় আমার বরদাস্ত হয় না। তা ভয় পাচ্ছেন কেন—একেবারে সরাচ্ছি নে তো! কাজিডাঙার বাড়িতে থাকবেন আপনারা। সম্পর্কও উঠে যাচ্ছে না—আসা-যাওয়া চলবে বরাবরকার মতো। তবে ছেলেপুলের পল্টন সঙ্গে নিয়ে আসবেন না। দোহাই!

ক্ষণ পরে আশুতোষ মুখ কালো করে এলেন।

শুনলাম, আমাদের নাকি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

উঁহু, বেশি দায়িত্ব দিচ্ছি। এই যত গাড়ি-বাড়ি অশন-বসন ঐশ্বর্য-অহঙ্কার—জানেন তো মামাবাবু, সমস্ত আসছে কাজিডাঙার মহাল ক'টা থেকে। বাবা নেই, দিনকালও খারাপ পড়েছে—জোত-জমি খুব ভাল ভাবে দেখাশুনোর দরকার। দিন-রাত চৌপহর এখন আপনাকে কাছারিবাড়ি পড়ে থাকতে হবে। নইলে দেখতে পাবেন, সব ম্যাজিকে উড়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে একটু কেমন ধরনের হাসির সঙ্গে জয়ন্তী আবার বলল, বিষয়-সম্পত্তির কাজে বরাবরই আপনি বাবার

চোখের আড়ালে থাকতে চাইতেন। হঠাৎ কলকাতার উপর এত টান পড়ল কিসে?

এই ক'মাসের মধ্যেই আশুতোষ হাড়ে-হাড়ে বুঝে নিয়েছেন, মনে মনে যা ছক কেটে ছিলেন, সে সব হবার নয়। বয়স কম হলে কি হয়, ভারি ধূর্ত মেয়েটা। আদর দিয়ে দিয়ে স্বর্গীয় বাবু মশায় এক গাছ-বাঁদর তৈরি করে গেছেন। তাঁর আমলে যেটুকু চলেছে—এর কাছে, দেখা যাচ্ছে, সেটুকুও চলবে না।

তবু সম্পর্ক টেনে বুনে মামা হন তিনি, শুধুমাত্র এষ্টেটের কর্মচারী নন। মনের রাগ চেপে মোলায়েম কণ্ঠে তিনি বললেন, হাবলি তোমার ছবির উপর নাকি কালি টেনেছে—

হাবলি আমার ফোটোর মুখে গোঁফ করে দিয়েছে, ধুমসি লাঠির খোঁচায় বড় আলোটার কাচ ভেঙেছে, লোটন নিজেরই নাক ভেঙেছে লাফালাফি করে, ন্যাপলা ক্রোটন আর গোলাপ-চারা কেটে বল-খেলার মাঠ বানিয়েছে। কোলের ছেলেটাও কাল সমস্ত রাত তাজ্জব কান্না কাঁদল—রূপকথায় বলে সুতোশঙ্খ সাপ—সুতোর ভিতর দিয়ে শঙ্খের আওয়াজ বেরোয়। ছেলেটা হল তাই।

আশুতোষ হাসিমুখেই বললেন, আচ্ছা—না মরি তো আমিও দেখব মা, কত দিন চুপচাপ ছিমছাম থাকে তোমার বাড়ি! মা হতে হবে তো এক দিন!

চমকে উঠে জয়ন্তী বলে, আমি—আমি কেন মা হতে যাবো?

বুড়ো বলেন, মাতৃত্বেই মেয়েদের মহিমা—

জয়ন্তী বলে, অমন শাপ-শাপান্ত করবেন না মামা। ক্ষুদে-রাক্ষস এক দল চোখের উপর নৃত্য করছে—ভাবতে গেলে আমার মাথা খারাপ হয়ে ওঠে।

মামা-মামী অতএব সদলবলে কাজিডাঙা চললেন।

যাবার মুখে নবদুর্গা বলে, থাক থাক, ঐ হয়েছে মা—আর পায়ের

ধুলো নিতে হবে না। বছরের মধ্যে বিয়েথাওয়া হয়ে সাবিত্রী-সমান হও, ছেলেপুলের বাড়-বাড়ন্ত হোক। বিয়ের সময়টা নিয়ে এসো কিন্তু, ভুলো না—

মনের জ্বলুনিতে বিনিয়ে বিনিয়ে আশীর্বাদ করছে।

ঠোঁট-কাটা জয়ন্তী জবাব দেয়, বাবা বেঁচে থাকলে তা হতে পারত বটে! এখন আমার কর্তা আমি—তোমার আশীর্বাদ ফলবে কি করে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে বিয়ের কথা নিয়ে এ বাড়ি ঢুকবে? ছেলে-পুলে? কিছু মনে কোরো না মামী, তোমার ওগুলোকে নিয়ে বলছিনে। ছেলেপুলে কাছে এলে আমার কেমন গা শিরশির করে ওঠে। কেন্নো-কেঁচোর মতো।

এই এক মেয়ে! আর এক মেয়ে, দেখ, রেবা।...তার পর?

অনিচ্ছুক অমরেশ ঘরের বাইরে এলো। কাছাকাছিও ওরা থাকতে দেবে না—না মনোরমা, না রেবা।

ফটিক এসে তার হাত ধরে টানে।

আসুন না মশায়—

অমরেশ বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু বাড়িওয়ালা মানুষ—ভাড়াটের রোষ বা সন্তোষ ফটিক গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

মেয়েদের ব্যাপার—এখানে কাজ কি আপনার? চলুন—তামাক খাবেন, গল্পগুজব করা যাবে।

ফটিক আর একটা ঘর তুলছে পাশের খালি জায়গাটুকুতে। কেন তুলবে না—খান তিনেক টিন উঁচু করে একটু আচ্ছাদন দিতে পারলেই যখন মাসিক অন্তত দশটা টাকার মার নেই।

মজুরদের উদ্দেশে কিছু হুকুম-হাকাম সেরে অমরেশের হাত ধরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলল। যাবে কতটুকুই বা! দু'সংসারের দুটো কামরা ছাড়িয়েই ফটিকের আস্তানা। দেয়ালে চুন-টানা, দরজা-জানলায়

রঙ-করা, লাল সিমেণ্টের মেঝে—এ যে বাড়িওয়ালার ঘর, তা আর বলে দিতে হয় না। অমরেশকে বারান্ডায় বসিয়ে তামাক ও গল্পের আয়োজনে ফটিক ঘরে ঢুকেছে। তার গল্প মুখে-মুখেই নয়—নক্সা ও কাগজপত্র সহযোগে। বছর কয়েক আগে এঁদো জমি বন্দোবস্ত নিয়ে এখানে সারবন্দি এই সব ঘর তোলে। অল্পস্বল্প বন্ধকি কারবারও আছে। সামনের একটু জমি খালি পড়ে রয়েছে মানুষ-চলাচলের জন্য। সেখানেও ঘর তোলা সম্ভব কি না—এবং কি কৌশলে তুললে ভাড়াটে বসানো যায়, আবার মানুষও চলতে পারে, এই তার একমাত্র গল্প ইদানীন্তন। কিঞ্চিৎ বুদ্ধিজ্ঞান-সম্পন্ন কাউকে পেলেই ফটিক ডেকে এনে দাওয়ায় বসায়, এবং গল্পের প্রয়োজনে নক্সা ইত্যাদি বের করে।

হুঁকো হাতে অমরেশ হুঁ-হাঁ দিয়ে যাচ্ছিল ফটিকের কথায়। হঠাৎ সজাগ হয়ে টান দিল কয়েকটা। ধোঁয়া বেরোয় না—কলকে নিভে আছে না টানার দরুন।

উয়া-উয়া—আওয়াজ আসছে না? হ্যাঁ...তাই তো! ছুটল অমরেশ।

মিসেস পালিত—

ভিতরে হাস্যধ্বনি। মনোরমা বলে, আপনাকে নিয়ে পারা গেল না! ছেলে হয়েছে। এখনই এসে পড়বেন না—দেরি আছে। আমি ডাকব।

ডাক এলো অনতি পরেই। ত্রস্ত কণ্ঠে মনোরমা বলে, দেখুন তো! শব্দ-সাড়া নেই, পোয়াতি চোখ মেলছে না—

আরও ব্যাকুল হয়ে কান্নার মতো স্বরে বলে ওঠে, ডাক্তার ডাকুন অমর বাবু। শিগগির। ভাল মনে হচ্ছে না।

করালী ডাক্তার দিবানিদ্রা অন্তে সবে ডাক্তারখানায় এসে বসেছেন। মানুষজন জমেনি। অমরেশকে দেখে অগ্নিশর্মা হলেন।

এমনি যেতে পারব না রোজ রোজ। টাকা নিয়ে এসেছ?

অমরেশ ভেবে এসেছিল, কাকুতি-মিনতি করবে—দরকার হলে হাত-পা জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু ডাক্তারের সামনে এসে তাঁর কথার ধরনে সব গোলমাল হয়ে গেল। সে-ও সমান তেজে বলে, টাকা দিতে পারলে আপনার কাছে আসব কেন?

টাকা দিয়ে কেউ বুঝি আমায় ডাকে না? বেগার খেটে বেড়াই, বাতাস খেয়ে থাকি—উঁ?

টাকা খরচা করে আপনাকে ডাকবে, তারা নিতান্ত গাধা।

এমনি কাটা-কাটা জবাব পেলে তবেই করালী সায়েস্তা হন। সবাই জানে। নরম হয়েছ তো গালাগালিই চলবে—তখন তাঁকে কাজে পাওয়া যাবে না।

কত গাধা আছে তবে পাড়ায়—আমার এনগেজমেণ্ট-বই থেকে হিসাব করে দেখ। হেঁ—হেঁ, চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে। হাতুড়ে গোবদ্যি নই। পাঁচ বছর পড়ে তবে পাশ করে এসেছি।

কিন্তু রোগি দেখেন মনোযোগ দিয়ে? গোড়া থেকে তো আপনাকে ডাকছি। দেখলে রেবার ওই অবস্থা হয়?

ভাল জিনিস কিছু খাওয়াবে না, শুধু অষুধের উপর রেখেছ। তা-ও মাংনা পাচ্ছিলে বলে। উল্টে এখন আমার উপরে চাপ।

করালী গজর-গজর করতে লাগলেন।

কি আবার আজকে? যেতে হবে? বলে ফেল—লজ্জা কিসের? ভিজিট অষুধের দাম সমস্ত লিখে রাখছি—সিকি পয়সা রেহাই দেবো না।

দিয়ে দেবো—সুদ সমেত নেবেন আদায় করে। যাবেন কিনা, তাই বলুন এখন।

এ বাড়ি-ঘর করালীর খুব চেনা। প্রতিটি সংসারে হামেশাই তাঁর ডাক পড়ে। ডাক্তারের সাড়া পেয়ে মনোরমা বেরিয়ে এলো।

তুই এসে জুটেছিস? ডাক্তারের ফী দিতে পারে না, নার্সের নবাবি! পাওনাগণ্ডা নগদ মিটিয়ে নিচ্ছিস তো রে?

অমরেশ বলে, এ'রও ধার। নবাব-বাদশা তো নই—নগদ কোথা পাবো?

করালী হেসে উঠলেন।

ধারে হাতি পাওয়া যায় তো হাতিই সই। বেড়ে কারবার ফে'দেছে!

অমরেশের বিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি সুর বদলে ফেললেন।

বাপু হে, চোখ রাঙাবে আবার খয়রাতি নেবে—দুটো এক-সঙ্গে হয় না। নরম হয়ে দু-একটা মিষ্টি কথা বলতে শেখো—তোমারই মঙ্গল হবে।

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

মনোরমা বলছিল, প্রসবের পর একবার চোখ মেলে দুটো-তিনটে মাত্তোর কথা বলল—

আর বলবে না—

ঝুঁকে পড়ে তিনি দেখতে লাগলেন, মণিবন্ধে হাত দিলেন। এত-ক্ষণের করালী ডাক্তার আর নেই। কম্পমান কণ্ঠে বললেন, বে'চে গেল মেয়েটা। আমিও বাঁচলাম—আর দৌড়োদৌড়ি করতে হবে না।

দু'খানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে যেন তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন। ফটিক এবং এ-কামরার ও-কামরার আরও দু-পাঁচ জন এসে জমেছে। বলছিল, এমন ডাক্তার হয় না। পয়সা লাগে না, আবার শ্মশানের কড়ি অবধি দিয়ে যায়।

করালীর কানে যেতে তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠলেন।

শ্মশানের কড়ি? মেথর-মুদ্দফরাশের জিম্মা করে দিও—এক পয়সাও ঐ টাকা থেকে খরচ হবে না। থাকতে দিল না দানা-পানি, ম'লে করবে ছানা-চিনি! বাচ্চাটা অনাহারে যেন না মরে ওর মায়ের মতো। সেই জন্য ধার দিয়ে যাচ্ছি।

ছেলে উয়া-উয়া কাঁদছে।

ডাক্তার বাবু! একটা সার্টিফিকেট লাগবে যে ডাক্তার বাবু—

করালী ছুটে চলেছেন। হাজার ডাকে এখন তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না, এটাও সকলে জানে। ডাক্তারি করে বুড়ো হয়েছেন—কত শত মরেছে তাঁর হাতে। মৃত্যু দেখলে তবু তিনি কেঁদে ফেলেন শিশুর মতো।

এক দিন ফটিক বলল, বউমার ঐ অবস্থায় এত দিন কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু বুঝে দেখুন মশায়। করপোরেশনের লম্বা ট্যাক্সো আর ভাড়াটের হাজারো বায়নাক্কা কুলিয়ে যা ছিটেফোঁটা থাকে, সেইটুকু নেড়ে-চেড়ে খাওয়া। তিন মাসের আপনি ভাড়া দেননি—দেবেন কোত্থেকে? চাইনে আমিও। তাই বলছিলাম দয়া করে যদি বাসাটাসা খুঁজে নেন আর-একটা—

ভদ্রলোক এবং লেখাপড়া-জানা লোক বলে গোড়ায় ক'দিন মোলায়েম অনুরোধের ভাষা। ক্রমশ সুর চড়ল।

বলছি, তা কথা যে মোটে কানে নেন না! বের হয়ে যাও—বললে সেটা কি শুনতে খুব উত্তম হবে মশাই?

যাই কোথা? তেমন আপনার জন কেউ তো নেই কোনখানে!

ফটিক ভরসা দিয়ে বলে, ভগবানের পিরথিমে জায়গার অভাব নেই। না মরে ভুত হবেন না—বেরিয়েই দেখুন না!

অমরেশ অগত্যা ঠেলাগাড়ি ডেকে নিয়ে এল।

ফটিক আশ্চর্য হয়ে বলে, ঠেলাগাড়ি চড়ে যাবেন নাকি মশায়?

সামান্য ক'টা জিনিস আছে—তক্তপোশখানা, রেবার ট্রাংক আর—

বলতে গিয়ে অমরেশের গলা ধরে আসে।

আর সে শখ করে এক দোলনা কিনেছিল আগেভাগে। তখন চাকরিটা ছিল—যা বলত, করতে পারতাম।

ফটিক বলে, জিনিসের জন্য ভাবনা করবেন না—সমস্ত থাকল এখানে। চাকরি-বাকরি জোটান, বাসা করুন—আমার বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে সমস্ত নিয়ে নতুন বাসায় তুলবেন। কত লোকের

কত জিনিস রাখি, দেখে থাকেন তো! কিছু নষ্ট হবে না। দুটি বছর রেখে দেবো। ছাড়িয়ে না নেন তো বেচে ফেলব তার পরে। দশের মুকাবেলা এই আমার কথা দেওয়া রইল।

ঠেলাগাড়ি ফিরে গেল। জিনিসপত্রের দায় চুকল, অনেকখানি নিশ্চিন্ততাও বটে! পাকিস্তানে দূর সম্পর্কের এক দিদি আছেন, ছেলেটাকে সেইখানে যদি রাখা যায়! কিছু কিছু খরচ দিলে দিদি রাজি হতেও পারেন। কিন্তু আপাতত খরচই বা জুটছে কোত্থেকে?

চিন্তিত মনে অমরেশ বেরুচ্ছে। মনোরমারাও এই বাড়ির ভাড়াটে—তাদের দুটো কামরা, একটা একেবারে রাস্তার উপরে। সেখানে মনোরমার বাপ জনার্দনের ছবি-বাঁধাইয়ের দোকান। দোকানের পিছনে ভিতর দিকে বাসা-ঘর।

মনোরমার নজরে পড়ে গেল।

বাচ্ছা নিয়ে কোথা চললেন এমন অসময়ে?

একেবারে চলে যাচ্ছি।

কেন?

উপায় কি বলুন? এ ভাবে চুপচাপ থেকে তো চলবে না। আবার ছেলের একটা গতি না হলে কাজকর্মের চেষ্টাও করতে পারছিনে।

ছেলেটা কাঁধের উপর চেপে রয়েছে বুঝি?

অমরেশ এক মুহূর্ত তাকাল মনোরমার দিকে। সেখানে কি দেখল, কে জানে—গভীরকণ্ঠে সে বলল, আপনি অনেক করছেন মিসেস পালিত। তা হলেও আমাদের গরিবের পক্ষে ছেলে একটা বোঝা বই কি!

বাস উঠিয়ে পাকাপাকি চলে যাচ্ছেন তা হলে? আমার ব্যবস্থা কি হল?

অমরেশ অবাক হয়ে তাকাল। মনোরমা বলে, ছেলে কোনখানে বিলিয়ে দিয়ে বিবাগী হবেন, এই মতলব করেছেন বোধ হয়?

জনার্দন চোখে কম দেখেন—পুরু কাচের চশমা, নিকেলের ফ্রেম, একটা ডাঁটা সুতো দিয়ে বাঁধা। কিন্তু কান খুব সজাগ। মেয়ের বাড়াবাড়ি

অসহ্য লাগে। দোকান থেকে হাঁক দিয়ে ওঠেন, নিজের সন্তান—বিলিয়ে দিক, আর জলে ছুঁড়ে ফেলুক তোর বলবার কি এক্তিয়ার আছে শুনি?

মনোরমা বলে, কিচ্ছু নেই। আমার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে যেখানে খুশি নিয়ে যান, যা ইচ্ছে করুন গে। কোন কথা বলতে যাবো না। তুমি যে বলছ বাবা—কষ্ট হয়নি ছেলে ধরতে? দিয়েছেন উনি তার দরুন একটা পয়সা? এখন সবসুদ্ধ সরে পড়বার তালে আছেন।

জনার্দন বলেন, পয়সার আশা ছেড়ে দে। কাকে দিয়েছে পয়সা, দেবে কোত্থেকে?

আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়েছে মনোরমার। এ করালী ডাক্তার নয়। সজোরে ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে সে বলে, হকের ধন—গায়ের রক্ত জল-করা পয়সা কিসের জন্য ছাড়তে যাব? কক্ষণো না।

কি করবি তবে?

ছেলে আটকে রাখব। টাকা শোধ করে তবে নিয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে রঙ্গস্থলে ফটিক দেখা দিল।

ধন্যি মেয়ে বটে! আমি গয়না বন্ধক রাখি, থালা-বাটি বন্ধক রাখি। একবার একজনের শিলনোড়াও বন্ধক রেখেছিলাম চার আনায়। সকলকে ছাড়িয়ে গেলে তুমি মনোরমা—হি-হি-হি—ছেলে বন্ধক!

বিরক্ত জনার্দন ফটিককেই সাক্ষি মানেন।

তাই দেখ তুমি—মাথায় এক ছিটে ঘিলু থাকলে কেউ ইচ্ছে করে এমন হাঙ্গামা জড়ায়? তুমি মালপত্র বন্ধক রাখো—সে সব একটা জায়গায় রেখে দিলে হল—নড়াচড়া করবে না, খাওয়াতে হবে না, সিকি পয়সা খরচা নেই। ছেলে আটকে রেখে এক্ষুণি তো তার জন্য মিছরি-সাবু-বার্লি কেনো—দুধ যোগান করো—কাঁদছে তো চুষিকাঠি কিনে দাও—

মনোরমা আগুন হয়ে বলে, যেমন হাড়কিপ্পন তুমি—মনের সাধ মিটেছে। বাপ-বেটি ছাড়া আধখানা বাড়তি খোরাকির দায় নেই। তা

ভয় নেই তোমার—সাবু-মিছরি তোমায় কিনতে বলব না,—আমার নিজের রোজগারে খাওয়াব।

জনার্দনও বলেন, তাই তাই। দেখি কত ক্ষমতা! অতি-বড় দিব্যি রইল—ছেলের জন্য সিকি পয়সা চাস যদি কোন দিন—

কলহের মধ্যে অমরেশ হতভম্ব হয়ে ছিল। ছেলে নামিয়ে দিয়ে হাসল এবার একটু। বলে, ভারমুক্ত হলাম—রুজি-রোজগারের ধান্দায় ঘোরা যাবে। গছিয়ে দিতে হত কোথাও না কোথাও। আপনি নিলেন—তা ভালই হল।

কয়েক পা গিয়ে কি ভেবে আবার ফিরল। বলে, আপনার পাওনা শোধ দিতে পারলে রেবার ছেলে দেবেন তো ফিরিয়ে? তখন কোন বাধা হবে না?

ছেলে বুকে তুলে মনোরমা মুখ ফিরিয়ে দুম-দুম করে ঘরে ঢুকে গেল।

অমরেশ এক বন্ধুর মেসে গিয়ে উঠল। দুপুর বেলাটা খায় সেখানে—ফ্রেন্ডচার্জ পাঁচ সিকে। রাতে খাওয়ার আবশ্যক হয় না, নিয়মিত নিমন্ত্রণ থাকে। এক বেলার এই পাঁচ সিকেও বেশি দিন দেওয়া চলবে না, সংগতি ফুরিয়ে এল। তখন...ভাবনা কিসের? ফটিকের উপদেশ মাথায় নিয়ে পৃথিবীর বিশাল তেপান্তরে বেরিয়ে পড়া যাবে। মরার বেশি ক্ষতি নেই—বেঁচেবর্তে জীয়ন্ত হয়ে থাকাটাই বা লোভনীয় কিসে?

একটা ইস্কুল-মাষ্টারির খোঁজে সেদিন বড়শে অবধি চলে গিয়েছিল। সে লোক আগের দিন নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আবার এই এত পথ হেঁটে মেসে ফিরে যাওয়া। চার পয়সার ট্রামে চড়বার বিলাসিতা ভরসায় কুলোয় না। অবসন্ন মনে ধীরে ধীরে চলেছে।

ঝকঝকে মোটর নিঃশব্দে একেবারে পিছনে এসে ইলেকট্রিক-হর্ন বাজিয়ে উঠল। চমকে উঠে অমরেশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার সেদিকে

তাকিয়ে রাস্তার কিনারায় গেল। চলেছে। মিনিট কয়েক পরে আবার সেই মোটর—এবং তেমনি হর্ন পিছনে।

মোটর আছে বলে কি পথ হাঁটতে দেবেন না মশায়?

মোটর থামল একেবারে। দরজা খুলে লাফিয়ে নামল সেই মেয়েটা—জয়ন্তী।

হাঁটতে যাবে কেন রয়েছে যখন মোটরগাড়ি?

অমরেশের সে হাত এ'টে ধরল। বলে, আমার নাম কক্ষণো মনে নেই। মনে করে রাখবার মতো নইও আমি। কিন্তু 'মশায়' বলে ডাকলে—ছি-ছি-ছি—মেয়েমানুষ আমি, তা-ও বুঝি ভুল হয়ে গেল?

চেয়ে দেখেছি নাকি?

রক্ষে পেলাম। দেখলে ঠিক চিনতে পারতে। অন্তত একটি মেয়ে বলে। কি বলো?

সত্যি বলি জয়ন্তী, যা তোমার বেশভূষা—আচমকা দেখলে সবাই পুরুষই ভাববে।...কিন্তু হাত ধরেছ কেন বলো তো?

কি মনে হয়?

টিপি-টিপি হাসে জয়ন্তী। বলে, রাস্তার মাঝে হঠাৎ এক মেয়ে এসে হাত ধরলে নানা কথা মনে হয়। নিজের হয়—আশেপাশে যারা দেখছে, তাদেরও হয়। মনে যা-ই হোক—তোমায় গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবো এই মাত্র। আপাতত তার বেশি নয়। একা-একা আমার ভয় লাগছে।

ড্রাইভার বনমালী ভিতরের সিটে প্রায় বিলুপ্ত। তাকে দেখিয়ে অমরেশ বলে, একা হলে কিসে?

ঐ তো বিপদ! সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চেহারা দেখ না—আস্ত একটা দুশমন, চোখ গোল-গোল করে তাকায়। ঐ লোকের সঙ্গে রাত-বিরেতে একলা ঘোরা কি ঠিক? তুমিই বলো না।

ধরে নিয়ে বসাল পাশের সিটে। জয়ন্তীকে জানে অমরেশ। জানে

প্রতিবাদ নিষ্ফল। কোলাহল জমিয়ে লোকের নজরে পড়া হবে শুধু।

গাড়ি ছুটেছে।

অমরেশ বলে, একটা নতুন কথা শুনলাম, তোমারও ভয় লাগে জয়ন্তী—

জয়ন্তী হুমকি দিয়ে ওঠে, অমন উবু হয়ে কেন—ভাল হয়ে বোসো না তুমি। ঘেন্না করছে?

না...মানে, ওধারে তুমি বসেছ—

ছোঁয়াছুঁয়ি হলে জাত যাবে? না গো—অত ছুঁৎমার্গী আমি নই। হাসি পায়—ট্রামে বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে, আর আমাদের পাশে খালি জায়গা। বলাও চলে না, বসুন এসে—

আটকায় কিসে?

লজ্জা-লজ্জা করে—এই আর কি! যদিও মানে হয় না এমন নিরর্থক লজ্জার।

তা হলে লজ্জা-ভয় দুটোই ঢুকেছে তোমার মধ্যে?

জয়ন্তী বলে, পুরুষের কিন্তু লজ্জা বেমানান অমরেশ। ক'বছরে এমন জরদ্গব হয়ে পড়েছ—ছি-ছি!

অমরেশ বলে, এক-পা ধুলো, ময়লা কাপড়-চোপড়—তার পাশে তোমার ঐ পরিপাটি সাজ। পাশে বসা মানায় না সত্যিই।

জয়ন্তী তার আপাদমস্তক সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকায়।

অমরেশ সভয়ে বলে, সামনে রাস্তার দিকে তাকাও। গাড়ি চালাচ্ছ যে!

জয়ন্তী বলে, কাপড় যাই হোক জামার যে আধখানাই নেই। এই পাগলের বেশে পথে বেরুলে কি করে?

ব্রেক কষে গাড়ি থামাল পথের পাশে।

চললে কোথা?

কৈফিয়ৎ দিতে পারি নে—

দু-পা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে জয়ন্তী বলে, জবাবদিহির

অভ্যাস নেই কি না! বাবার আদুরে মেয়ে ছিলাম—সমস্ত তুমি জানো। বোসো, আসছি এখুনি—

ঢুকল এক শৌখিন পোশাকের দোকানে। অনতি পরে একটা প্যাকেট হাতে বেরিয়ে এল।

পাঞ্জাবি তোমার গায়ে হবে কি না দেখ তো! এবং নিজেই তার গায়ের উপর মেলে ধরে বলে, ঠিক হবে। আমার আন্দাজ কি রকম দেখ।

অমরেশ রাগ করে ওঠে, আমার জন্য কেন জামা কিনবে? আমি নেবোই বা কেন?

জয়ন্তী বলে, কে বললে তোমার জামা? এক আত্মীয়ের ফরমায়েস আছে। দেখতে তোমার মতো। তাই মাপটা দেখছিলাম।

জামা ভাঁজ করে ষ্টার্ট দিল।

এ কোন দিকে চললে? আমি শহরে ফিরব।

আমি ডায়মণ্ডহারবার যাব, আমাদের কাজি-ডাঙ্গার দিকে—

তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে নাকি?

নইলে তুললাম কেন গাড়িতে?

বেশ মজা! কাজকর্ম নেই আমার?

না, নেই নিশ্চয়! তুমি বেকার। নইলে এই দশা! কলেজে সাদা-মাঠা পোশাকে আসতে—কিন্তু ভিখারির সজ্জায় নয়।

দোহাই তোমার, রাস্তার দিকে চেয়ে কথা বলো। গাড়ি ছুটছে আর তুমি আমার দিকে তাকিয়ে—সবসুদ্ধ যমালয়ে নিয়ে তুলতে চাও?

শহরের সীমানা পার হয়ে গ্রামাঞ্চলে এসে পড়েছে। কথাবার্তা নেই। লাভ কি বকাবকি করে—এ পাগলের হাত এড়ানো যাবে না, অমরেশ নিশ্চিত জানে। মেসের সংকীর্ণ শয্যায়, তা ছাড়া, গুটিসুটি হয়ে পড়ে থেকে কি এমন মোক্ষলাভ হবে? যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাক—একটু বৈচিত্র্য ভোগ করে আসা যাবে জয়ন্তীর আতিথ্যে।

হঠাৎ জয়ন্তী চমকে উঠল।

ঘাড়ের ওখানটা কি হয়েছে তোমার?

কি?

লাল টকটকে হয়ে আছে। দেখি, জামাটা তোলো একটু উঁচু করে।

তাচ্ছিল্যের সুরে অমরেশ বলে, ছারপোকার কামড়ে বোধ হয়—

উঁহু। গম্ভীর ভাবে জয়ন্তী ঘাড় নাড়ল। লেপ্রসির গোড়ার দিকে এমনটা হয় জানি। আহা, জামা খুলে ফেল না—দেখি আমি ভাল করে।

অমরেশ বলে, খুলছি। কিন্তু গাড়ি রোখো—

অনুরোধ রাখল জয়ন্তী। ইঞ্জিন কাঁপছে, এক্সেলেটরে এক-একবার পায়ের চাপ দিচ্ছে আর গর্জে উঠছে গাড়ি। শতচ্ছিন্ন জামাটা যেই খুলেছে, জয়ন্তী একটানে কেড়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে ছাড়ল গাড়ি। খিল-খিল খিল-খিল হাসি। গতি বাড়ছে ক্রমে—টপ-গীয়ারে চলেছে।

মুহূর্তের ব্যাপার। অমরেশ বুঝতে পারছে না ভাল করে। বলে, কি করলে?

নতুন জামা পরবে না যে! না পরো তো থাক খালি গায়ে।

গাড়ি দৌড়ল বিষম জোরে। স্পীডোমিটারে মাইল উঠছে—চল্লিশ —পঞ্চাশ—ষাট—

ক্ষণ পরে অমরেশ প্রশ্ন করে, কার বাড়ি নিয়ে তুলছ বলো তো ঠিক করে? কি পরিচয় দেবে আমার?

কোন আশ্চর্য রকম পরিচয়ের প্রত্যাশা করো নাকি অমরেশ?

তার পর হেসে উঠে বলে, অন্য কারো বাড়ি নয়—আমার নিজস্ব কাছারি। কাউকে কিছু বলতে যাবো না—যার যেমন খুশি ভেবে নেবে। কিন্তু জামা না পরে খালি গায়ে নামতে পারবে তো অত লোকের মধ্যে? ভেবে দেখ।

জামা তুলে নিতে হয় অগত্যা। গায়ে ঢোকাতে ঢোকাতে অমরেশ বলে, পথে পেয়ে তেড়ে ধরা—এ অতি অন্যায় জবরদস্তি। কাউকে কিছু বলে আসতে পারলাম না—

বলবার মতো আছে না কি কেউ? সত্যি বলো, কে কে আছে?

কেউ নেই—

ঘাড় নাড়ল অমরেশ। স্তব্ধ হয়ে রইল একটুখানি।

না, কেউ নেই আমার—

স্বর অতি করুণ, যেন কান্নার আভাস। জয়ন্তী হেসে উঠল।

আমারও তাই। কেউ না থাকাই তো ভালো!

হাসির উচ্ছ্বাসে সে যেন ভেঙে পড়ছে। বলে, বাবা নেই, মা নেই —আমারও কেউ নেই ত্রিভুবনে। তাই দেখ, মজা করে মোটর চালিয়ে বেড়াচ্ছি। বাবা থাকলে দিত এমন পথে পথে ঘুরতে?

অমরেশ বলে, মোটর আছে তাই তোমার মজা। কিন্তু দোহাই জয়ন্তী, রয়ে-সয়ে মজা করো। এত জোরে নয়, মাথা ঘোরে।

এ তো ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে যাচ্ছে। জোরে চালিয়ে দেখাবো?

সভয়ে অমরেশ বলে, না গো, রক্ষে করো—

চোখ বোজো। ঠেসান দিয়ে পড়ো সিটে।

উড়িয়ে নিয়ে চলেছে যেন। পৃথিবীর ধূলা-মাটির অনেক ঊর্ধ্বে —অন্তরীক্ষে...গতিবেগে তারা ছিটকে ছিটকে চলেছে। অমরেশ চোখ বুজে আছে—শুনতে পাচ্ছে একটানা মৃদু গম্ভীর আওয়াজ গ্রহলোকের অশ্রুতপূর্ব গীতিগুঞ্জনের মতো।

কতক্ষণ চলেছে! ঘুম এসেছিল বোধ হয় অমরেশের। ধড়মড়িয়ে এক সময়ে খাড়া হয়ে বসল। রাত্রি। আম-বাগানের মধ্যে গাড়ি এসে থেমেছে।

জয়ন্তী বলে, তুই চল্ বনমালী আমার সঙ্গে। তুমি গাড়ির মধ্যে থাক অমরেশ।

জঙ্গলে বসে থাকব?

জঙ্গল কোথা? আমাদের কাছারি ঐ যে—

নির্নিরীক্ষ অন্ধকারে জয়ন্তী আঙুল দেখাল। কিন্তু ঘর-বাড়ির

কোন চিহ্ন নজরে আসে না। বনমালী আর সে বড় বড় গাছের আড়ালে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েকটা খানা-ডোবা ও বাঁশঝাড় পার হয়ে—হাঁ, আছে বটে বাড়ি একখানা। কাছারিবাড়ি এটা—খিলানওয়ালা একতলা পাকা দালান। সদর রাস্তার উপর বড় ফটক। জয়ন্তী পিছনের সুঁড়ি-পথ ধরে এসেছে। বনমালীকে রোয়াকের নিচে দাঁড় করিয়ে মৃদু পায়ে উঠে এসে থামের পাশে দাঁড়াল।

কাছারি সরগরম। আবাদ বাঁধবন্দি হচ্ছে। মজুরেরা মাটি কাটার রোজগণ্ডা মিটিয়ে নিচ্ছে নায়েব-গোমস্তার কাছ থেকে। জয়ন্তী দাঁড়িয়ে আছে কতক্ষণ ধরে। জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন বলে হোক অথবা সবাই হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত—সেই কারণে হোক, কারো সেদিকে নজর পড়ল না। শেষটা নিজেই সে আত্মপ্রকাশ করে। নায়েবের পাশে বসে পড়ে বলল, জমাখরচটা দেখি একটু—

ঘরের মধ্যে এবং তার নিজেরই মাথায় বজ্রপাত হয়েছে, নায়েবের মুখ-ভাব এই রকম। কথাটা যেন বোধগম্য হচ্ছে না— এমনিভাবে বলল, আজ্ঞে?

খাতা এগিয়ে দিন। দেখব।

কিন্তু সে অবধি অপেক্ষা করল না। নিজেই হাতবাক্সর উপর ঝুঁকে খস-খস করে জমাখরচের পাতায় পাতায় সই করল। খাতা বন্ধ করে রেখে সহজ কণ্ঠে বলে, মামাকে দেখছিনে যে?

বাসাবাড়ি চলে গেছেন। কাছারি সাতটায় বন্ধ কিনা! আমরাও উঠছিলাম। তা বলেন তো ডাকতে পাঠাই তাঁকে।

জয়ন্তী তটস্থ হয়ে বলে, সে কি কথা! বুড়ো মানুষ—তায় আমার মামা। আমরাই যাচ্ছি তো বাসাবাড়ি। আপনি বরঞ্চ একটা কাজ করুন নায়েব মশায়। গাড়িটা গোপলাধোবা-আমতলায় রয়েছে—গোটা দুই লোক ডেকে দিন, ধুয়ে ভাল করে সাফসাফাই করে দেবে।

বাসাবাড়ি আরও খানিকটা দূরে একেবারে গঙ্গার উপরে। জয়ন্তীর বাপ শিবচরণ মাঝে মাঝে এসে থাকতেন—শখের বাড়ি, আসবাবপত্রের অভাব নেই, শহুরে শ্রীছাঁদও বাড়িটার সর্বাঙ্গে। উপরের খান দুই ঘর আলাদা করা আছে, মনিবেরা খেয়ালখুশি মাফিক এসে পড়লে যাতে অসুবিধাগ্রস্ত না হন। বাকি অংশ আশুতোষের দখলে। আছেন পরম আরামে—তবু শিবচরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেন যে এ সমস্ত ছেড়েছুড়ে কলকাতায় উঠেছিলেন, তিনিই তা বলতে পারেন।

আশুতোষ শুষ্ক কণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, এসো, এসো। বুড়োবুড়ি আমরা কত দিন বলাবলি করি, এখানে এতগুলো আশ্রিত প্রতিপাল্য আছে—মা-জননী তাদের একটি বার দেখতে আসে না। এত-দিনে মনে পড়ল তা হলে?...বনমালী, তুই বাবা একেবারে হাত-পা ধুয়ে এসে বোস। কখন বেরিয়েছিস, ক্ষিধে পেয়েছে—মুড়ি-গুড় আম-কাঁঠাল এনে দিচ্ছে, খা বসে বসে।

অমরেশকে লক্ষ্য করে বলেন, এ ছেলেটিকে চিনতে পারছি নে তো!

অমরেশ আগ বাড়িয়ে পরিচয় দেয়, পথে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন।

খবর পেয়ে নবদুর্গা এবং ছেলেমেয়েদের যে ক'টি ঘুমোয় নি, সকলে এসে পড়ল। বিষম সোরগোল। জেলেপাড়ায় লোক ছুটল। মাছ পাওয়া গেল না। ঐ রাত্রে তখন জাল নামানো হল কাছারির বাঁধা-পুকুরে। অল্প-স্বল্প মিলল।

অমরেশকে জয়ন্তী প্রশ্ন করে, রাতে কি খাও তুমি?

কি জবাব দেবে সে, চুপ করে থাকে। পেট ভরে কলের জল খায়—আর কিছু নয়। মেসের মতো বলতে পারল না, নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়ায়। জয়ন্তীর কাছে পার পাওয়া যাবে না ওসব বলে, এ মেয়ে অত সহজ নয়। অশেষ জেরার মধ্যে পড়বে।

জয়ন্তী বলে, ভাত না লুচি-রুটি? যা দরকার মামাকে বলে দেব। সঙ্কোচ কোরো না, পাড়াগাঁ হলেও কোন রকম অসুবিধা হবে না।

অমরেশ বলে, দেখতেই পাচ্ছি। অগাধ ঐশ্বর্য তোমার। এতখানি

ধারণায় ছিল না। কিন্তু আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না—যা-ই দেবে, নিশ্চয় তা আশার অতীত আমার কাছে।

জয়ন্তী হেসে উঠে বলে, সে কি গো, কতটুকু আশা তোমার? মামার মতন তোয়াজ করে কথা-বলা তোমার মুখে বড় বিশ্রী লাগে অমরেশ—

খাবার সময় দেখা গেল, লুচি-পোলাও দুই-ই আছে। সুবৃহৎ থালার চারদিকে বৃত্তাকারে নানা আয়তনের বাটি—কতগুলো তরকারি, গণে শেষ করা দায়। এতদূর আয়োজন জয়ন্তী নিজেও ভাবতে পারেনি।

আবার এর উপর নবদুর্গা সামনে বসে পড়ে অনুযোগ করছে, খবরবাদ না দিয়ে এসে পড়লে মা। এ তো কলকাতার শহর নয়—কিচ্ছু পাওয়া যায় না। দোকান-পাট যা দু-চারটে আছে, এ রাত্রে সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কোন যত্নআত্তি করতে পারলাম না, আমার লজ্জা করছে পাতের কাছে সামান্য এই ক'টা জিনিষ আনতে। তুমি মা অবিশ্যি ঘরের মানুষ—কিন্তু সংগে এই ছেলেটি এসেছেন।

জয়ন্তী বলে, রাত্তিরবেলা বিনা খবরে এসে পড়েছি—ভাঁড়ার থেকে এতগুলো জিনিষ বেরুল। কলকাতার কথা কি বলছেন—আমরা এর সিকিও জোটাতে পারতাম না। আরামে আছেন সত্যি আপনারা।

নবদুর্গাকে এক সময়ে আড়ালে পেয়ে আশুতোষ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন। মেয়েমানুষ—আখের বুঝে কাজ করতে জানো না। কি দরকার ছিল এত যোগাড়যন্তোর করবার?

ওদের খাচ্ছি পরছি—বাড়ির উপর এসেছে, খাওয়ালে-দাওয়ালে খুশি হবে—

মুণ্ডু হবে। সন্দেহ করছে। পঞ্চাশ টাকা মাইনেয় ভাঁড়ার থেকে ঘি-ময়দা বাদাম-পেস্তা বেরোয় কি করে? মন খারাপ হয়ে গেছে। বলেও ফেলল তাই মুখ ফুটে।

যাক, যা হবার সে তো হয়ে গেছে। এখন হায়-হায় করে লাভ নেই।

কিন্তু ছোঁড়াটাকে কি হেতু জুটিয়ে আনল? খাতির এতখানি যে খেতে বসবে—তা-ও পাশাপাশি হওয়া চাই। দুশ্চিন্তায় আশুতোষ ঘুমোতে পারেন না—অবিরত এপাশ-ওপাশ করছেন। অমরেশও শুয়েছে সেখানে। দু-জনের এক ঘরে শয্যা।

আশুতোষ প্রশ্ন করেন, ঘুমোলে নাকি বাবা?

এত বড় এস্টেট মুঠোর মধ্যে—সে মানুষের মুখের কথা এমন অমায়িক আর মোলায়েম! অমরেশ তাজ্জব হয়ে যায়। বিনীত কণ্ঠে বলে, আজ্ঞে না—

একটু খেয়ালি আমার ভাগ্নী—কিন্তু বড্ড ভালো। গেল-বছর ওর বাপ মারা যান—মরবার সময় হাতে ধরে আমার উপর সমস্ত ভার দিয়ে গেছেন। এখন আমি যা করব তাই।

অমরেশ বলে, আপনারাও বড় ভালো। আমি লোকটা কে, কি বৃত্তান্ত—কিছুই জানেন না। কিন্তু যে রকম যত্নটা করলেন, আমি অবাক হয়ে গেছি।

কি আর করেছি, কতটুকুই বা সাধ্য! জংলি গাঁয়ে পড়ে আছি, মানুষজন কেউ এলে বর্তে যাই। কিন্তু তোমায় এর আগে দেখি নি বাবা, পরিচয়টা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার ভাগ্নী যে-সে লোককে খাতির করে না তো!

অমরেশ বলে, নিতান্তই সামান্য লোক—বেকার। অবস্থা দেখে জয়ন্তীর হয়তো করুণা হয়েছে। নইলে এমন-কিছু খাতির ছিল না কোন দিন। ঐ যা বললেন—খেয়ালি মানুষ। আমিও ভেবে পাচ্ছি নে, কেন টেনে নিয়ে এলেন এখানে, কেন এমন যত্ন?

একটুখানি ইতস্তত করে আবার বলল, দেখুন, আমি বড় বিপন্ন। আপনাদের এস্টেটে তো অনেক লোকজনের দরকার হয়। এর মধ্যে আমাকে একটু নিতে পারেন না? চাকরির কথা জয়ন্তীকে বলতে পারি নে—একসঙ্গে পড়েছি, সঙ্কোচ হয়।

বললেই বা কি হবে? এ সব তার এক্তিয়ারে নয়। চাকরির বহাল-বরতরফ সমস্ত আমার হাতে।

আশুতোষের নিজের ক্ষেত্র এটা। এস্টেটের ম্যানেজার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাঁর মধ্যে, কণ্ঠস্বর মুহূর্তে বদলেছে। বললেন, লোক তো রয়েইছে—নতুন লোক নেবার জায়গা কোথায়? অভিজ্ঞতা আছে তোমার? বলি, জমিদারি-লাইনে কাজকর্ম করেছ?

আজ্ঞে না। শিখে নেব। কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।

কিন্তু ইংরেজিনবিশ নব্য লোক তোমরা—পোষাতে পারবে? জয়ন্তী মা'র ক্লাসফ্রেণ্ড বলছ—সেই খাতিরে না হয় একটা গোমস্তা করে দেওয়া গেল—তার বেশি আপাতত হয়ে উঠবে না। পনেরো টাকা মাইনে, ওর মধ্যে খাওয়া-পরা—

আশ্চর্য হয়ে অমরেশ বলে, পনেরো টাকায় খাওয়াই তো হয় না একটা লোকের—

তাই তো বলছিলাম, ইংরেজি পড়ে গোল্লায় গিয়েছ—তোমাদের কর্ম নয়। খাওয়া হয় না—গোমস্তারা তবে কি বাতাস খেয়ে থাকে? ঐ পনেরোর মধ্যে দুধ-ঘি, সময় বিশেষে পোলাও-কালিয়াও খাচ্ছে, আর মাসে মাসে বিশ-পঞ্চাশ করে বাড়ি পাঠাচ্ছে।

বলেন কি?

মুরুব্বিয়ানার হাসি হেসে আশুতোষ বলেন, এ সব তোমাদের কলেজে-শেখা অঙ্কের হিসেবে মিলবে না। আমার বাড়ির এই যে একটু ঠাটঠমক দেখতে পাচ্ছ—মাইনে কত করে নিই আন্দাজ করো তো? পাঁচ-শ' ছ-শ'—কি বলো? যাক গে—শুনে লাভ নেই। ও সব মাথায় ঢুকবে না। মনিবেরাও জানে। আমাদের মাইনে মাসে মাসে নয়—দু-বছর তিন বছর অন্তর একদিনে হিসাব করে মাইনে চুকিয়ে নিই।

অমরেশ সসম্ভ্রমে স্বীকার করে নেয়।

ঠিক বলেছেন। আমার ধারণায় আসে না। তাই বলছি, দয়া করে

যদি যৎসামান্য পেটের ভাত জোটাবার মতো মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিতে পারেন, আমি আপনাদের কাজে লেগে যাই। আর ঘুরে বেড়াতে পারি নে।

আশুতোষ জাঁক করে বলেন, তা পারব না কেন, খুব পারি। পনেরোর জায়গায় পঁচিশ করে দিলে কে আটকায়? জয়ন্তীরও আমার উপর কথা বলবার তাগত নেই। তবে মুশকিল হল, একজনকে দিলে সবাই সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরবে। যাকগে, যাকগে। তুমি ঘুমোও তো এখন। কাল তারপর ভেবে দেখব।

দিতেই হবে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে—

ঘুমোও—

বলে অনতিপরে আশুতোষও ঘুমিয়ে পড়লেন। নিশ্চিন্ত হয়েছেন, ছোকরা শুধু মাত্র চাকরির উমেদার। এবং জয়ন্তীর কিঞ্চিৎ দয়া হয়েছে, তার অধিক কিছু নয়। বুকের উপর থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেল।

আশুতোষ ঘোর থাকতেই উঠে পড়েন। জয়ন্তী শহুরে মেয়ে হলেও দেখা গেল তার অভ্যাস আশুতোষের মতন। কে আগে উঠেছে বলা কঠিন। নিচের বারান্ডায় মুখ ধুতে এসেছিল জয়ন্তী। সেই-খানে দেখা হল।

চলুন মামা, কেমন বাঁধ করলেন—ঘুরে দেখে আসি।

আশুতোষের চমক লাগে। বললেন, এখনি রোদ উঠে যাবে—কষ্ট হবে যে মা! নতুন মাটি দেওয়া হয়েছে, এবড়ো-খেবড়ো পথ। তার উপর দিয়ে তুমি মোটে হাঁটতেই পারবে না, এই একটা কথা বলে দিলাম।

জয়ন্তী হেসে বলে, আচ্ছা দেখতে পাবেন। আপনিই পারবেন না আমার সঙ্গে হেঁটে।...এক কাজ করুন—আমিন মশায়কে খবর দিয়ে পাঠান ফিতে-টিতে নিয়ে তাড়াতাড়ি যাতে চলে আসেন।

আমিন কি করবে?

মাটি কেটেছে—সেই সব খানাখন্দ মেপে দেখা যাবে। আমিন ছাড়া

মাপজোপ করবে কে? আপনিও তো সমস্ত নিজে দেখতে পারেন না, অন্যের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়। যাচ্ছি যখন, মনে সন্দেহ রাখা ঠিক নয়। কি বলেন?

আশুতোষ স্তম্ভিত হলেন। তাঁকে অবিশ্বাস করছে এই একফোঁটা মেয়ে—কালকে যাকে ফ্রক পরে নেচে বেড়াতে দেখেছেন। তাই আবার এমনি স্পষ্ট করে মুখের উপর বলা!

খানা মেপে কি বুঝবে মা! সেই যে ক'দিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল —খানা তাতে অর্ধেক ভরাট হয়ে গেছে।

তবু আন্দাজ পাওয়া যাবে। আপনি তৈরি হয়ে আসুন মামা। তাড়াতাড়ি করুন, রোদ উঠে গেলে কষ্ট হবে।

চা এসে পড়ল। এই এত সকালেই নবদুর্গা নিজ হাতে লুচি-মোহনভোগ তৈরি করে এনেছে। কলকাতায় থাকবার সময় দেখে এসেছে, জয়ন্তী খুব ভোরে ওঠে এবং উঠেই চা খায়। বারান্ডায় বেতের চেয়ার-টেবিল পড়েছে, অমরেশ এসে বসেছে। জয়ন্তী ডাকে, মামা চা খাবেন না?

না—

রাগে গর-গর করতে করতে আশুতোষ ঘরে ঢুকে গেলেন তৈরি হবার জন্যে। এত করছেন তাঁরা—ঐ-রাতে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ধরালেন, এক প্রহর রাত থাকতে উঠে স্ত্রী চা-খাবার বানিয়ে তোমার মুখে তুলে ধরছে, তবু গিয়ে স্বচক্ষে বাঁধ দেখতে হবে! জমিদারনী হয়ে পড়ে তোমার মাথা ঘুরে গেছে, আস্পর্ধা বড় বেড়েছে! মাটি-কাটার হিসাব তো যথারীতি পাঠানো হচ্ছে—হেরফের যদি কিছু হয়েই থাকে, ধরে ফেলবে এমন সাধ্য তোমার নেই। তুমি তো তুমি, তোমার বাপ চেষ্টা করে যাক কেওড়াতলা-শ্মশানঘাট থেকে উঠে এসে—সে-ও পেরে উঠবে না। এই কর্মে চুল পাকিয়েছি, পাকাপোক্ত আমার কাজ-কর্ম।

চায়ের বাটি শেষ করে জয়ন্তী তিন লাফে উঠানে নামল।

কাছারি যাওয়া যাক মামা। আমিন মশায় তো ঐখানে আসছেন! আপনাদের জমাখরচের খাতাটাও সঙ্গে নিতে হবে—ওতে মাটির মাপ রয়েছে।

আশুতোষ বললেন, তা তো আছেই। আর সদরে তোমার কাছেও পাঠানো হয়েছে হপ্তায় হপ্তায়—

সমস্ত নিয়ে এসেছি, একটাও হারায়নি। বাঁ-হাতে ঝোলানো ফোলিও-ব্যাগ একটু উঁচু করে তুলে জয়ন্তী দেখিয়ে দিল। বলে, আপনাদেরটাও চাই। গোলমাল দেখলে তখন মেলানো যাবে।

কাছারিবাড়ি এত সকালে বন্ধ এখন। আশুতোষের কাছে একটা অতিরিক্ত চাবি থাকে। বেজার মুখে তালা খুলে তিনি খাতা বের করে দিলেন।

কয়েকটা পাতা উলটে জয়ন্তী বলে, এটা কি? খালের মুখে জল সরাবার বাক্স বসানো হল, তা আবার জোয়ারে ভেঙে গেল—এ সব কিচ্ছু হয় নি।

আশুতোষ রুষ্ট স্বরে বললেন, তোমার কাছে হিসাব গেছে, দেখ তার সঙ্গে মিলিয়ে—

এমনি সময় নায়েব দেখা দিল।

জয়ন্তী কঠিন কণ্ঠে বলে, এ জমাখরচের খাতা জাল। কাল পাতায় পাতায় সই করে দিয়ে গেলাম—সে খাতা বের করুন নায়েব মশায়।

খাতা বেরুল। জয়ন্তী চেপে বসল ফরাশের উপর।

কি চমৎকার—আমায় একেবারে মনগড়া হিসাব পাঠিয়ে আসছেন, স্রেফ কল্পনাবিলাস! এমন রচনাশক্তি আপনাদের, গল্প-উপন্যাস লেখেন না কেন? নাম-যশ হয়, মুনাফাও বেশি। আমায় মিথ্যে খরচ দেখিয়ে ডুপ্লিকেট খাতা বানিয়ে এত তোড়জোড় করে ক'-টাকাই বা পেয়েছেন!

আশুতোষের মুখের উপর দু-চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করে বলে,

সম্পর্কে মামা আপনি—বুড়ো মানুষ, মা-বাপ-মরা ভাগ্নীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতে কাছারি বসে আছেন—

সহসা সুর বদলে বলল, নিজে কিছু দেখেন না বুঝি?

জবাব দেবার মতো কিছু পেয়ে আশুতোষ বেঁচে গেলেন। জয়ন্তীর কথা লুফে নিয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই বটে মা-জননী। কিচ্ছু করে না হারামজাদারা—একা আমি দুটো চোখে কত আর দেখব? যে দিকে না যাব, ঠিক একটা অনাছিষ্টি ঘটিয়ে বসে আছে! রোসো, দেখাচ্ছি এবার। উঃ, আমায় ভালোমানুষ আর সরল-বিশ্বাসী পেয়ে—

জয়ন্তী বলে, ভালোমানুষ আর তার উপরে বুড়ো মানুষ। অমরেশকে তাই নিয়ে এসেছি। ইনি এখানকার সমস্ত ভার নেবেন মামা। বয়স হয়েছে, আপনি আর কত খাটবেন?

আশুতোষ ক্ষণকাল কথা বলতে পারেন না। এত দিন ধরে এত প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে এসে এই কাছারিবাড়ির উপরেই শেষটা এমন লাঞ্ছনা ঘটবে, এ তিনি স্বপ্নে ভাবতে পারেন নি। ধুরন্ধর মেয়েটার সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না—নিঃসংশয়ে বুঝলেন তিনি। বললেন—যেন হাহাকারের মতো শোনাল।

আমরা খাব কি মা? এক পাল পুষ্যি, সবাই উপোস করে মরবে —তাই তুমি চাও?

উপোস করবেন কেন? যেমন আছেন তেমনি থাকবেন এখানে। আর মাসে দু-শ টাকা করে পাবেন। এস্টেটের কোন কাজকর্ম করতে হবে না।

এবারটা মাপ কর মা। ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেছে—ওরাই করেছে, আমি কিছু জানিনে।

জয়ন্তী বলে, পঞ্চাশ টাকায় চালাচ্ছিলেন, সেখানে দু-শ টাকাতেও পারবেন না?

খিলখিল করে হেসে উঠল। এক আশ্চর্য মেয়ে—ক্ষণে মেঘ, ক্ষণে রৌদ্র!

কাছারিবাড়ির সামনে বিস্তীর্ণ উঠান নদীতে গিয়ে মিশেছে। সূর্য উঠছে নদীজলে। খোলা দরজার পথে জয়ন্তীর নজর পড়ল সেদিকে। জমাখরচের খাতা সরিয়ে দিয়ে ছুটে সে উঠানে নামল। জল ও আকাশ টকটকে লাল। একা দেখে সুখ হয় না। ছোট্ট মেয়ের মতো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকে, অমরেশ, শিগগির এদিকে এসো—শিগগির—

আমিন এসে দাঁড়ালেন। জয়ন্তী ভ্রূকুটি করে, কি চাই আপনার?

ডেকে পাঠিয়েছেন আমায়। মাপজোপ করতে হবে।

কিছুই মনে পড়ছে না আর এখন জয়ন্তীর।

কিসের মাপজোপ?

বাঁধের মাটি কাটা হয়েছে, তাই আবার আপনি নাকি মেপে দেখতে চান—

অমরেশ বেরিয়ে আসতে পূর্বাকাশে আঙুল দেখিয়ে জয়ন্তী বলে. কলকাতার গর্তের ভিতর দেখে থাক এ বস্তু? দেখ, দু-চোখ ভরে দেখে নাও—

আমিন তখনো দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আমার মামা নিজে ব্যবস্থা করে মাটি কাটিয়েছেন—আমি তার দেখব কি? মাপ উনি নিয়েছেনও তো একবার—

কিন্তু ম্যানেজার মশাই যে বললেন—

বলে থাকেন, যান তাঁর কাছে। একবার কেন—বিশ বার তিনি মেপে দেখতে পারেন। আমার অত শখ নেই রোদে রোদে ঘুরবার।

আশুতোষ বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এ খেয়ালি মেয়ের অন্ত পাওয়া ভার। দেয়ালে-টাঙানো কালীর পটের দিকে অলক্ষ্যে নমস্কার করলেন। মা-কালী রক্ষা করেছেন—দশের মুকাবেলা আর কেলেঙ্কারির দায়ে পড়তে হল না তাঁকে। তবে এটা নিশ্চিত বুঝলেন, শিবচরণের আমলে যেমন ছিলেন এখন থেকে তার শতগুণ সামাল হয়ে চলতে হবে।

জয়ন্তী অমরেশকে ডাকল, চলো—বেড়িয়ে আসা যাক খানিকটা—

এখন? রোদ উঠে গেল যে! জষ্ঠির রোদ বড্ড কড়া—

গলে যাবে নাকি? ননীর পুতুল?

যাচ্ছে দুজনে পাশাপাশি। আশুতোষের ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। পিছন থেকে বললেন, আমিন তবে ফিরে যাক—কি বলো মা?

জয়ন্তী নিতান্ত নিরাসক্তভাবে বলে, আমি তার কি জানি! আমি বাবা পেরে উঠব না ধুলো-কাদা মেখে মাটি মেপে বেড়াতে। তাতে আপনার বাঁধ বাঁধা হোক আর নাই হোক।

পুরো ভাঁটা এখন। জল অনেক নেমে গেছে, চর বেরিয়ে পড়েছে। নদীর কিনারায় নতুন বাঁধের উপর দিয়ে অনেক দূর তারা চলে গেল। জয়ন্তী এক সময় অমরেশের হাত ধরে ফেলে।

কি?

শক্ত কাঁকুরে মাটি, পায়ে লাগছে—

খালি পায়ে আসা ঠিক হয় নি।

আবদারের ভঙ্গিতে জয়ন্তী বলে, মাটি ফেলে ফেলে কি রকম করে রেখেছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব হয়তো কোন সময়। তার চেয়ে নিচে দিয়ে চলো যাই—

জল-কাদা ওখানে—

উচ্ছল জলতরঙ্গের মতোই জয়ন্তী হেসে ওঠে।

রোদে ভয়, জলেও ভয়?

কিন্তু জয়ন্তীর হাত এড়াবে হেন সাধ্য কার? অমরেশ সন্তর্পণে এগুচ্ছে আর জয়ন্তী ছুটছে বীর দাপে—দু-খানি পদ-তাড়নায় ছররা-গুলির মতো চতুর্দিকে কাদা ছিটকে ছিটকে পড়ছে। উপভোগ করছে যেন কাদায় পায়ের পাতা ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলা। গদগদ হয়ে একসময়ে বলে উঠল, আহা, যেন ফুলের উপর দিয়ে হাঁটছি—

কাদা হল ফুল! ক্রমেই তাই বেশি কাদার দিকে নামছ। যাবে কোথায় বলো তো?

ঐ যেখান থেকে সূর্য উঠল—

অতল জল ওখানে।

জলে ডুবব, চলো যাই—

আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! যা গতিক, সত্যি সত্যি অমনি কিছু করে বসা নিতান্ত অসম্ভব নয়। তুমি বড়লোক মানুষ—ইচ্ছা মাত্রেই অজস্র পাচ্ছ, পেটের দায়ে ছুটোছুটি করতে হয় না। আত্ম-জন অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরছে—এ তোমার অতি-বড় কঠিন কল্পনারও অতীত। গঙ্গার লবণাক্ত পলি ফুলের মতো লাগে পদতলে, আজগুবি খেয়াল-খুশি তোমাকেই মানায়। সকলে ভাগ্যবান নয় তো তোমার মতো...

এবং যা ভেবেছিল তাই। পা হড়কে পড়ে গেল জয়ন্তী।

অমরেশ ব্যস্ত হয়ে তুলে ধরল। তখনো সে খিল-খিল করে হাসছে।

কাদার মধ্যে পথ চলেছি আর গায়ে কাদা মাখব না, সে কি হয়? তোমার কিন্তু ও-রকম সাফসাফাই হয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না অমরেশ। কেউ বিশ্বাসই করবে না যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলে।

অমরেশ জাঁক করে বলে, জল-কাদা ভাঙা আমার এক দিনের ব্যাপার নয়। অভ্যাস আছে—তাই আছাড় খাইনে।

আছাড় না খেয়ে বুঝি কাদা মাখা যায় না?

জয়ন্তী কাদা ছিটিয়ে দিল তার গায়ে। বিরক্ত হয় অমরেশ। পথ থেকে নিজের এলাকায় টেনে নিয়ে এসে গরিব বেকার জেনেই এই আচরণ। সমান-সমান হলে কি পারত?

মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এত সমস্ত মনোভাব বুঝে দেখবার বুদ্ধি জয়ন্তীর নেই। হাত ধরে টানে, এসো—

কোথা?

জলে ডুববার কথা হচ্ছিল না? ভুলে গেলে?

একেবারে জলের কিনারে নিয়ে এসেছে। অমরেশ সাবধান করে দেয়, কুমীর থাকে এ সব অঞ্চলে—

শুনে জয়ন্তী থমকে দাঁড়াল, তবে তো ভয় ধরিয়ে দিলে—

কিন্তু মরতেই যখন তৈরি, কুমীরের ভয় কেন?

জয়ন্তী বলে, কুমীরে ধরলে তো কুমীরের পেটেই যেতে হবে। জলে ডোবা হবে না। তা হলে উপায় কি?

বাসায় ফিরে যাওয়া—

এই জলকাদা-মাখা অবস্থায়? জানো, ভরা-কাছারি চলছে এ সময়। কত প্রজাপাটক, আমলা-পাইক। এমনি ভূতের মূর্তি নিয়ে দাঁড়ানো যায় তাদের সামনে?

অমরেশ বলে, কাছারির দিকে না গিয়ে চুপিচুপি বাসায় ঢুকে পড়ব।

রাত্তির বেলা হলে হতে পারত। ছোট্ট জায়গা—মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীযুক্তেশ্বরী জয়ন্তী দেবী সশরীরে হাজির হয়েছেন—জানা-জানি হতে কিছুই বাকি নেই। গিয়ে হয়তো দেখব, দর্শনের জন্য মানুষজন কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিরক্ত হয়ে অমরেশ বলে, আবার রাত না হওয়া পর্যন্ত তবে তো চরের উপর ঘোরা ছাড়া উপায় নেই।

অথবা কুমীরের পেটে-যাওয়া। আর কোন পথ দেখিনে। এই বেশে ডাঙায় উঠতে কিছুতে আমি পারব না।

জলে গিয়ে নামল। কুমীরের কবল সত্যি সত্যি পছন্দ করল নাকি? অমরেশকে বলে, তুমি যাও—

অমরেশ হতভম্ব, কি করবে ভেবে পায় না। তখন হেসে জয়ন্তী বলে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সরে যাও। কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফেলি। আমার হয়ে গেলে তুমি তারপর এসো।

রোদ খুব প্রখর। গায়ের ভিজে কাপড় এরই মধ্যে শুকিয়ে এসেছে। অমরেশ বলে, ফেরা যাক। অনেকটা দূর আসা হয়েছে—মাইল দুয়েক হবে। বেলাও হয়েছে—জোয়ার এসে গেল, দেখছ না?

জয়ন্তী ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

হুঁ, বেলা হয়েছে সত্যি। হাঁটতে হাঁটতে ক্ষিধে পেয়ে গেল।

অমরেশ বলে, মামীমা, গিয়ে দেখবে, কত কি সাজিয়ে নিয়ে বসে

আছেন। রাত্তিরে দুঃখ করছিলেন কিছু জোগাড় করতে পারেন নি বলে। দিনমানে ক্ষোভ মিটিয়ে নেবেন।

অত সবুর সইবে না—

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে জয়ন্তী। ছোট খাল বেরিয়েছে অদূরে—খালধারে সারি সারি খোড়োঘর।

ওদিকে যাচ্ছ কোথা?

পিছনে তাকায় না জয়ন্তী, ভ্রূক্ষেপ করে না। হন-হন করে চলেছে পাড়ার দিকে। ইচ্ছে হয়, পিছনে পিছনে চলে আসুক অমরেশ। নয়তো প্রয়োজন নেই—কারো মুখাপেক্ষী নয় সে।

সর্বপ্রথমে যে বাড়ি, সেই উঠানে ঢুকে পড়ল। ঢেঁকিশালে ধান ভানছে মাঝবয়সি বউটা। পুরুষ মানুষ কোন দিকে কাউকে দেখা যায় না। তবে আর কি! ঢেঁকিশালের ছাঁচতলায় গিয়ে জয়ন্তী বলে, ক্ষিধে পেয়েছে—কিছু খেতে দিন।

পাড় দেওয়া বন্ধ করে বউ অবাক হয়ে দেখছে। এমন চেহারা—সোনার পদ্ম থেকে নেমে লক্ষ্মীঠাকরুন ধুলোমাটির উঠানে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু বিপর্যস্তবেশা। আচ্ছা...ভাল ঘরের মেয়ে পাগল হয়ে যায় নি তো? কোথা থেকে এলো হঠাৎ এই বাড়ির মধ্যে।

জয়ন্তী বলে, জষ্ঠিমাসের দিন—আর কিছু না পাও, গাছের আম-কাঁঠাল রয়েছে। দাও কিছু লক্ষ্মীভাই, তাড়িয়ে দিও না। তাড়াতাড়ি করো। আমি তোমার ধান ভেনে দিচ্ছি ততক্ষণ।

উঠান পার হয়ে বউ পুবের ঘরের দাওয়ায় উঠল। বিস্ময়ের তার সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু কিছু বলবারও অবসর হল না, পিছন পিছন এক পুরুষ মানুষ—অমরেশ এসে দাঁড়াল। জয়ন্তী তখন আড়া ধরে তার উপর শরীরে ঝোঁক দিয়ে ঠিক ঐ বউটার মতন ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে। অমরেশ সকৌতুকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। বাহাদুরি দেখাচ্ছে তার সামনে? কিম্বা হয়তো বিনা কাজে চুপ করে থাকা এ চঞ্চলার ধাতে সয় না।

বাড়ীর কর্তা এসে পড়লেন। ঢেঁকিশালে নজর পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

মা-জননী—আপনি? তা ওখানে ঢেঁকিশালে কেন—ছি-ছি, এ কি করছেন সন্তানের বাড়ি এসে?

আপনার বাড়ি বুঝি আমিন মশায়? তবে তো ভালই হয়েছে—নিজের জায়গায় এসে উঠেছি।

খুব হাসতে লাগল জয়ন্তী। বলে, বউ ঠাকরুনের একটু কাজ করে দিচ্ছি। তাতে দোষের কি হল? ক্ষিধে পেয়েছে, উনি গেলেন আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে।

মুকুন্দ তটস্থ হয়ে বলেন, আজ্ঞে না...সে কি কথা! গরিবের বাড়ি কত ভাগ্যে পায়ের ধুলো পড়ল তো ঢেঁকিশালে কেন? আসুন আপনি, ইদিকে এসে ভাল হয়ে বসুন। নইলে আমার শান্তি হবে না—পদতলে গিয়ে আছড়ে পড়ব।

অমরেশ ইতিমধ্যে দাওয়ায় জলচৌকির উপর বেড়া ঠেস দিয়ে বসে পড়েছে।

জয়ন্তী দেমাক করে, দেখলে তো, কেমন ধান ভানতে পারি আমি?

কলকাতায় তোমার লাইব্রেরি-ঘরের একদিকে ঢেঁকি বসিয়ে নিলে কেমন হয়, তাই ভাবছিলাম আমি।

ঐ দাওয়ারই প্রান্তে একটু জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে দুখানা ঠাঁই করল। জয়ন্তী বলে, এত কি করছেন বলুন তো? একটা করে আম দিন হাতে—খেয়ে চলে যাই, ও-সব হাঙ্গামার দরকার নেই।

বউটি ততক্ষণে প্রকাণ্ড দুই থালায় আম কেটে কাঁঠালের কোয়া ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। নিজে মুকুন্দ ঝকঝকে-মাজা কাঁসার গেলাসে জল পুরে এনে দিল।

আর খাবারের গন্ধে হোক, কিম্বা জয়ন্তীর পরিচয় ছড়িয়ে যাওয়ার দরুনই হোক, পিলপিল করে একগাদা ছেলেমেয়ে এসে পড়ল। নানা

বয়সের—ছ'মাস থেকে বছর বারো-চোদ্দ, সকল ধাপেরই আছে। নিতান্ত বাচ্চাগুলোকে বড়রা কাঁখে করে এনেছে।

খাওয়ার স্ফূর্তি উপে গেল জয়ন্তীর। তবে এটা নিজেদের বাড়ি নয়—নবদুর্গাকে যেমন বলেছিল, এখানে তা চলে না।

বিরক্তি যথাসম্ভব গোপন করে—বরঞ্চ মুখে একটু হাসির মতো ভাব এনে জয়ন্তী বলে, পাড়া ভেঙে এসেছে যে!

মুকুন্দ বলেন, পাড়া কোথায়—সবই এ বাড়ির। আমার ছ'টা, ছোট ভাইয়ের আটটা আর এক বিধবা দিদি আছেন তাঁর হলগে তিন। কত হল দেখুন এবারে যোগ কষে।

একটা-কিছু বলতে হয়, জয়ন্তী তাই বলে ওঠে, চমৎকার! সচকিত হয়ে মুকুন্দর দিকে তাকায়, মনের ভাব বেরিয়ে পড়ল না তো!

মুকুন্দ বলেন, সাত-আট গণ্ডা মুখে ভাত জোগাতে হয়, এই তো বিপদ! চমৎকার বলা যেত মা-জননী, যদি ও-গুলোকে শুধু হাওয়া খাইয়ে রাখতে পারতাম—

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, ব্যাকরণের 'অনাদরে ষষ্ঠী' আমার সংসার হুবহু খেটে যাচ্ছে। এত দূর-ছাই করি, কিছুতে তবু মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদ কমে না।

হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল, ব্যস্ত ভাবে তিনি রান্নাঘরের দিকে গেলেন। কয়েকটি বাচ্চা ইতিমধ্যে সাহস করে দাওয়ার উপর উঠে খাওয়ার জায়গার সামনাসামনি জাপটে বসেছে। আমের এক এক টুকরা থালা থেকে উঠে মুখ-বিবরে গিয়ে পড়ছে—অন্তর্বর্তী যাবতীয় প্রক্রিয়া তারা নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে নিরীক্ষণ করছে।

অমরেশ সর্বাধিক নিকটবর্তী মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করে, খাবে খুকি?

হ্যাঁ—বলে তৎক্ষণাৎ সে হাত পাতল।

এক চোকলা হাতে তুলে দিতে পাশের ছেলেটা বলে, আমায় দিলে না?

দেব বই কি, সক্কলকে দেব।

আম শেষ হয়ে গেলে সেই আগের মেয়েটা বলে, আমি কাঁঠালও খুব ভাল খাই।

জয়ন্তী বললে, ভাল যখন খাও—তাই বা ছেড়ে দেবে কেন? শুনতে পাচ্ছ না অমরেশ, কাঁঠাল চাচ্ছে—

কাঁঠাল-কোষগুলাও অমরেশ বাঁটোয়ারা করে দিল। চক্ষের পলকে সমস্ত সাবাড়। ভ্রূকুঞ্চিত করে জয়ন্তী দেখছিল। ব্যঙ্গের সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, আর খাবে?

হ্যাঁ—

নিজের থালাটা ঠেলে দিল ওদের মধ্যে। দিয়ে সে মুখ ফেরাল। রাক্ষসগুলোর কাড়াকাড়ি চোখ মেলে দেখবার রুচি নেই। ভয়ও করে খাওয়ার রীতি দেখে।

দু'হাতে দুটো বাটি নিয়ে মুকুন্দ রান্নাঘর থেকে বেরুলেন। জয়ন্তী উঠে পড়েছে। মুকুন্দ বলেন, একি, খাওয়া হয়ে গেল এর মধ্যে? ক্ষীর দিয়ে কাঁঠাল খেতে হয়—আমি তার একটু ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম মা—

জয়ন্তী তিক্ত কণ্ঠে বলে, সে জন্য দুঃখ করবেন না। কিছু নষ্ট হবে না। হ্যাগো, ক্ষীর খাবে তোমরা?

হুঁ—উঁ—উঁ—

ক্ষীরের বাটি চালান করে দিল।

মুকুন্দ বলেন, সবই বোধহয় ওদের দিয়ে খাইয়েছেন। মা কিছু মুখে দিলেন না গরিবের বাড়ি।

জয়ন্তী একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ক্ষীর-ভোজনরত ছেলেপুলের দিকে। অমরেশকে বলে, সারাদিন ধরে খাওয়া চলবে নাকি? হাত-মুখ ধোবে না?

একদল পাতিহাঁস আঁস্তাকুড়ের ময়লা খুঁচে খুঁচে খাচ্ছে। আঁচাতে গিয়ে জয়ন্তী নিম্নকণ্ঠে অমরেশকে বলে, এই হাঁসের পাল—আর দেখ,

দাওয়ার উপর ঐগুলোকে। এক রকম নয়? খাওয়াবার ইচ্ছে ছিল তো পল্টন কি জন্য এগিয়ে দিলেন আমিন মশায়?

পান সেজে বাটায় সাজিয়ে নিয়ে মুকুন্দর বউ দাঁড়িয়ে আছে। পান দিয়ে জয়ন্তীর পায়ের গোড়ায় ঢিব করে সে প্রণাম করল।

মুকুন্দ অমরেশকে দেখিয়ে দেয়, এঁকেও। আমাদের নতুন ম্যানেজার। ইনিই সর্বময় এখন। হবে না? মা-জননী একেবারে পুকুর-চুরি ধরে ফেলেছেন।

জয়ন্তী হেসে ফেলল।

এটা বাড়িয়ে বললেন আমিন মশায়। পুকুর অবধি ওঠেনি—খানা-খন্দ দু-চারটে।

মুকুন্দ জোর দিয়ে বলেন, তাই বা কেন হবে? জানেন না মা, আপনার হকের ধন মেরে অষ্টপ্রহর এখানে মচ্ছব চলছে।

তবু উত্তপ্ত হল না জয়ন্তী। বলে, কিছু না, কিছু না—হকের ধন আবার কিসের? ধন-সম্পত্তি ঈশ্বর কি কাউকে ইজারা দিয়ে গেছেন? দৈবাৎ পেয়ে গেছি—খাচ্ছি-দাচ্ছি মজা করে।

অমরেশ কিছু জানে না, কখন ইতিমধ্যে যে নতুন ম্যানেজার হয়ে পড়েছে। মুকুন্দর কথা বিমূঢ়ের মতো শুনছিল। তার দিকে চেয়ে জয়ন্তী বলে, তাই তো, ভুল হয়ে গেছে তোমায় বলতে। তুমি ছিলে না সে সময়টা—হঠাৎ একেবারে সর্বময় হয়ে পড়েছিলে। এখন অবশ্য চুকেবুকে গেছে। বুঝলে না—হুমকি দিয়ে আরও বেশি কাজ যাতে পাই! বয়স চেহারা কোনটাই আমার প্রবীণের মতো নয়—তাই দুটো গরম গরম কথা বলতে হয় পশার বাড়ানোর জন্য।

ও হরি, আসলে কিছুই নয়—শুধু পশার বাড়ানোর ব্যাপার! মুকুন্দ অনেক আশায় নতুন মুরুব্বির তোয়াজ শুরু করেছিল—সমস্ত ভুয়া! তার মুখ মলিন হয়ে গেল। মুখ টিপে হেসে জয়ন্তী বলে, ঠক-সিঁধেলদের বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে গোলমাল করতে নেই—বিপদ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাই মাপ করে দিয়েছি। কিন্তু পাকা লোক

হয়েও আপনারা কেন বোঝেন না আমিন মশায়?

মুকুন্দ তটস্থ হয়ে বলেন, আজ্ঞে?

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরেরা এস্টেটের চাকরিতে আসেন না, সবাই জানে। মামার দোষের কথা লিখে আমায় তো এদ্দুর অবধি টেনে নিয়ে এলেন, তিনি যদি এর পর আপনার পিছনে লেগে যান?

মুকুন্দ আকাশ থেকে পড়লেন। আমি কখন লিখলাম মা?

হাসতে হাসতে ফোলিও-ব্যাগ থেকে জয়ন্তী ডাকের শিলমোহর-আঁকা পোস্টকার্ড বের করে ধরল।

বেনামিতে লিখেছেন। কে আমার এত বড় সুহৃৎ, কিছুতে ভেবে পাচ্ছিলাম না। এখন 'পুকুর-চুরি' 'হকের ধন' কথাগুলো শুনে পরিষ্কার হয়ে গেল। হুবহু চিঠির ভাষা।

মুকুন্দ আমতা-আমতা করে বলেন, আজ্ঞে, আমি তো—

আপনিই লিখেছেন। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। আর 'পুকুর চুরি' যদি লিখতে বলি, অবিকল এমনি হরপই হবে। কিন্তু এক দলের মধ্যে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করা...ছিঃ!

মুকুন্দ চুপ করে রইলেন। জয়ন্তী বলে, আপনি এমন করলেন—অথচ মামা দেখি আপনার কথা বলতে অজ্ঞান। আমায় ধরেছেন, আমিন মশায় ভারি কাজের লোক—মাইনে না বাড়ালে অবিচার হবে। দিতে হল তাই দশ টাকা বাড়িয়ে। খবর জানেন না বুঝি, আপনার দশ টাকা মাইনে বেড়েছে।

ঢোক গিলে মুকুন্দ বললেন, না—তাই বলছি—আশুবাবু সত্যি সত্যি অতি মহাশয় লোক।

কেবল ঐ একটু চুরি-চামারির অভ্যাস—

মুকুন্দ হাঁ-হাঁ করে ওঠেন। ওকথা বলবেন না, আজ্ঞে। সাগরের জল আঁজলা ভরে নিলে সাগরের কি ক্ষতি হয় বলুন। বলে নিই আর না বলে নিই—খাচ্ছি পরছি আপনারই। সে আর নতুন কথা কি? সবাই জানে।

মুকুন্দ সঙ্গে গিয়ে বাসাবাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবেন, কিন্তু জয়ন্তীর ঘোরতর আপত্তি। বুড়ো মানুষ রোদের মধ্যে অন্দূর যাবেন, আবার ফিরে আসবেন—না, কিছুতে হতে পারবে না। নদীর ধারে ধারে এই তো সোজা পথ—এত অপদার্থ ভাবছেন কেন যে পথ চিনে যেতে পারব না?

অমরেশ আঘাতে আঘাতে মুশড়ে পড়েছিল—এই প্রাণোচ্ছল মেয়েটার সংস্পর্শে সে নতুন জীবন পেয়েছে, দুঃখ-বেদনা ভুলে আছে কাল সন্ধ্যা থেকে। একটা না একটা খেয়ালে মেতে আছে জয়ন্তী—আশ্চর্য এক ক্ষমতা, আনন্দ আহরণ করে নিতে পারে সকল ক্ষেত্র থেকেই। খর রৌদ্র মাথার উপরে, খাওয়াও হল না—তবু দেখ, কেমন হাসতে হাসতে যাচ্ছে—খুনসুটি করছে অমরেশের সঙ্গে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে এক-একটা সামান্য সাধারণ কথায়।

হাসি হঠাৎ নিভে গেল। বাঁধের ধারে নালায় মাছ ধরা হচ্ছে, অনেক লোক জড় হয়েছে...কোমরে ঘুনসি-বাঁধা দিগম্বর ছেলে অনেকগুলি। হাঁ করে চেয়ে আছে তারা—দেখাচ্ছে জয়ন্তীকে আঙুল দিয়ে! জয়ন্তী জোরে চলছে—খুব জোরে। হাঁটা নয়—দৌড়ানো বলে একে। অমরেশ পিছনে পড়ে যাচ্ছে, ওর সঙ্গে তাল রাখা দায়। বাঁধের নতুন-তোলা মাটির চাংড়ায় ঠোক্কর খেয়ে একবার জয়ন্তী উহু—করে বসে পড়ল। অমরেশ ছুটে যায়। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জয়ন্তী—হাত ধরে তুলল তাকে। উঠে দাঁড়িয়ে আবার হাসতে লাগল।

বড় যেন আনন্দ! লাগেনি?

লাগেনি আবার! তবে অল্পের উপর দিয়ে গেছে। আনন্দ সেই জন্য।

এক নজর পিছনে তাকাল। ছোঁড়াগুলোকে দূরে অতিক্রম করে এসেছে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক—এইবারে সামাল হয়ে ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে।

কিন্তু অমন দৌড়চ্ছিলে কেন? বাঘ দেখে পালাচ্ছ, এমনি ভাব।

জয়ন্তী বলে, বাঘের চেয়েও ভয়ানক। দৌড়চ্ছিলাম চোখ বুজে। ল্যাংটা প্রেতগুলো না দেখতে হয়!...একবার কি হল, বলি শোন। গাড়ি বিগড়েছে এক গ্রামের মধ্যে। যত ছা-বাচ্চা ছেঁকে এসে ধরেছে। আমার গতিক দেখে বোধ হয় মজা পেয়ে গেল। যত বলি, চলে যা—কেউ আর নড়ে না। শেষটা চারটে করে পয়সা দিলাম। তাতে আরও বিপদ। একজন গিয়ে পাড়ার মধ্যে বলে দেয়—পয়সার লোভে দশজন চলে আসে। বাচ্চার ঝাঁক দেখলে সেই থেকে বড় ভয় লাগে আমার।

অমরেশ বলে, ছেলেপুলে হল নারায়ণ। যীশু বলেছেন, শিশুদের কাছে আসতে দাও—কারণ স্বর্গরাজ্যটা তাদের।

স্বর্গে তবে আমার গরজ নেই অমরেশ। মরার পর নরক-বাস করব।

অমরেশ বলে, সে তো অনেক পরের কথা। বিস্তর সময় পাবে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবার। প্রার্থনা করি, সে দিন মোটে না আসুক। কিন্তু আপাতত কি করছ। সামনে ঐ জেলেপাড়া—পাড়ার ভিতর দিয়ে পথ। বাইরে ছিটকে-পড়া ঐ ক'টা ছেলে দেখে আঁৎকে উঠলে, পাড়ায় তো অগুন্তি। আজকে আবার কিন্তু সেই মোটর বিগড়ানোর ব্যাপার হবে।

অসহায় ভাবে জয়ন্তী বলে, তবে?

জোয়ারবেলা এখন সব জলে ভরতি। তখনকার মতো বাঁধ ছেড়ে যে চরের উপর দিয়ে যাবে, তার জো নেই—

অধীর কণ্ঠে জয়ন্তী বলে, বলো একটা কোন উপায়। নয় তো ভাঁটার সময় পর্যন্ত বসে থাকতে হবে কি এখানে?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে উপায় সে নিজেই ঠাওরাল। গাঙের দিকে নেমে যাচ্ছে। অমরেশকে ডাকে, এসো—

কোথায়? না জয়ন্তী, আবার এক দফা কাদা মাখতে আমি রাজি নই।

ডাকছি, এসোই না। কাদা মাখতে হবে না।

তারপর ছুটে এসে যেন বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে তার হাত এঁটে ধরল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অমরেশ বলে, কি হচ্ছে বলো দিকি? ওরা সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, কি মনে ভাবছে—

জয়ন্তী তাচ্ছিল্য করে বলে, যা ইচ্ছে ভাবুক গে। তুমি কিছু ভাবছ না তো? তা হলেই হল।

ভাবছি বই কি!

জয়ন্তী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, সেটা অবস্থার অতিরিক্ত হয়ে যাবে। পরে পস্তাবে।

ঠিক ঐ কথাই ভাবছি আমি। বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বলতে গেলে রাজরাণী তুমি—এ তোমার রাজ্য। বিবেচনা করে চলা উচিত এখানে।

ঘাড় দুলিয়ে জয়ন্তী বলে, সেই জন্যেই তো! পাড়ায় পা দিলেই ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ তটস্থ হয়ে উঠবে। ভারি বিশ্রী লাগে—আমি যেন আজব দেশের মানুষ। পাড়ার মধ্যে আমি কিছুতে ঢুকব না।

ছোট্ট ডিঙি বাঁধা আছে ঝোপের পাশে—জোয়ার-বেগে দুলছে। জয়ন্তী লাফিয়ে উঠল তার উপর। একদিকে কাত হয়ে খানিক জল উঠে গেল। পাকা মাঝির মতো বসে পড়ে বোঠে হাতে নিয়ে জয়ন্তী হুকুম করে, কাছি খুলে দাও—

অমরেশ বলে, এত টানের মুখে ভেসে পড়া ঠিক হবে না। ডাঙায় এসো।

জয়ন্তী বলে, আমি একাই যাচ্ছি তা হলে। ডাঙায় ডাঙায় তুমি হেঁটে যাও। পাড়া পার হয়ে গিয়ে খাল-ধারে তুমি দাঁড়িও—সেইখানে নামবো আমি।

এমন অবস্থায় আর দ্বিধা করা চলে না, কাছি খুলে দিয়ে অমরেশ গলুয়ে উঠে পড়ল। আনাড়ি হাতের বোঠে ধরা—ডিঙি টলমল করছে। তারপর স্রোতের মুখে পড়ে তীরবেগে ছুটল।

জয়ন্তী হাততালি দিয়ে ওঠে।

কি জোরে ছুটেছে! কেমন বাইতে পারি তা হলে দেখ।

অমরেশ সভয়ে বলে, বোঠে ছেড়ে বাহাদুরি করছ, টানের মুখে নৌকো বানচাল হবে—

বেশ তো, মজা করে সাঁতার কাটা যাবে—

সাঁতার জানো তুমি?

দিইনি কখনো সাঁতার। কিন্তু শক্তটা কি? হাত-পা মেলে জল দাপাদাপি করলেই ভেসে থাকা যায়—

দোহাই তোমার! হাত-পা মেলে আবার তা দেখিয়ে দিতে হবে না। বোঠে বাও, শিগগির ধরো বোঠে। নৌকোর মাথা ঘুরে গেল যে!

জয়ন্তী অভিমান করে বলে, অত বোকো না। জীবনে এই প্রথম ধরলাম বোঠে। এর চেয়ে আর কি হবে? এ-ই বা ক'জনে পারে?

জোয়ারের নদী অভিমানের মর্যাদা রাখে না। অবস্থা সঙ্গিন হয়ে ওঠে। অমরেশ বোঠে ছিনিয়ে নিল, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল জয়ন্তীকে।

সরো, কি সর্বনাশ, কি তোমার দুঃসাহস! যায় যে নৌকো!

প্রাণপণে বাইছে। হাতের পেশী ফুলে ফুলে উঠছে। কিন্তু ঐটুকু এক বোঠের সাধ্য কি, গতি আটকাবে। তীরবেগে ছুটেছে মাঝ-নদীর খরস্রোতে পড়ে। খড়-বোঝাই বৃহৎ এক সাঙড়ের গায়ে সজোরে গিয়ে লাগল। অমরেশ সর্বশেষ প্রান্তে—ছিটকে পড়ল সে আঘাত পেয়ে। কিম্বা প্রাণের জন্য হয়তো বা জলে লাফিয়ে পড়েছে। আর্তনাদের মতো উঠল নিমেষের জন্য। একটুখানি শুভগ্রহ—আট-দশটা জোয়ান লাফিয়ে পড়ল সাঙড় থেকে। ডিঙি ধরে ফেলে অনেক কষ্টে সাঙড়ের কাছে নিয়ে আসা হল। জয়ন্তী রক্ষা পেয়েছে। আর অনতি দূরে দেখা যাচ্ছে, অমরেশ স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণে ভেসে থাকবার চেষ্টায় আছে।

অনেকক্ষণ অনেক চেষ্টার পর অমরেশকে তোলা গেল। এলিয়ে পড়েছে সে। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে এতক্ষণ কোন রকমে যুঝছিল। সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল নৌকোর উপরে এসে।

খোকন, তোর বাপ অতি পাষণ্ড। জোচ্চোর, ফেরেববাজ। তোকে গছিয়ে দিয়ে পালাল। দেখতেও আসে না একবার। কেন আসে না বল্ দিকি? ভয় আছে, পাছে তোমাকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিই—

খোকন বলে, অ'—

খবরের কাগজ হাতে নিয়ে মনোরমা শুয়েছিল খোকার পাশে। হঠাৎ খোকা কাগজের প্রান্ত মুঠি করে ধরল।

রাখো, রাখো—ছিঁড়ে যাবে যে! ফটিকের কাগজ—আবার ফেরত দিতে হবে। পড়বার ইচ্ছে হয়েছে? খোকন আমার ভারি বিদ্বান—কাগজ পড়বে। আচ্ছা, তুমিই পড়ো তা হলে—

খোকন, দেখ, দুই হাতে কেমন ধরেছে কাগজটা! প্রবীণ মানুষের মতো। দৃষ্টি ঘুরছে এদিক থেকে ওদিক। সত্যি সত্যি পাঠ হচ্ছে যেন। খবরটা বল না খোকন, নতুন মিনিস্টার কে কে হল? ওমা, কি কুরুক্ষেত্তোর ব্যাপার—দুম-দুম করে দুই পা দাপাচ্ছে কাগজ ছেড়ে দিয়ে। মিনিস্টার পছন্দসই নয় বুঝি?...এই যা—গেল তো ছিঁড়ে? তোকে নিয়ে পারা যায় না খোকন, দস্যি ছেলে হয়েছিল তুই। এখনই এই—আর যখন বড় হবি—হাঁটতে শিখবি?

এতক্ষণে জনার্দন আহ্নিক সেরে উঠে এলেন।

কি বকছিস রে একা-একা?

একা নয়, খোকনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। বুদ্ধি কত! সব বুঝতে পারে। নইলে তাক বুঝে সায় দেয় কেমন করে?

মনোরমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বাপের ভাত বেড়ে দিচ্ছে। আর সময় নেই, অসময় নেই—জনার্দনের সেই এক কথা। মেয়ের সঙ্গে আর যেন বলবার কিছু নেই।

এ মাসেরও ভাড়া দিতে পারলাম না। ফটিক তড়পাচ্ছে। উপায় দেখ্ মনো। পরের পোলার সোহাগ করেই দিন কাটাবি?

এইটুকুতেই মনোরমার চোখে জল এসে যায়।

সবাই ঝেড়ে ফেলতে পারো বাবা, আমি যে পারিনে! কত কষ্ট করে বাঁচিয়ে তুলেছি, কত রাত জেগেছি—

তার মজুরো কেউ দেবে না রে—সমস্ত বরবাদ! সে বেটা এক নম্বর শয়তান—পালিয়ে রয়েছে। বেঁচেছে পালিয়ে গিয়ে। বয়ে গেছে তার টাকা-পয়সা মিটিয়ে ছেলে ফেরত নিতে।

কিন্তু আমি কি করি এখন? ছুঁড়ে ফেলে দেবো রাস্তার নর্দামায়? কি করতে বলো তুমি আমায়?

জনার্দনও ভেবে হদিস পান না। এ যে বিষম বিপদ হল! হায় ভগবান! চিরকাল ধরে পুষতে হবে ঐ ছেলে?

শুনছিস তো খোকন, বাবা দিনরাত দুষছেন। কি যে করি তোকে নিয়ে! মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবার— তাই সব সময় অমন খিট-খিট করেন। বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখেন না—অভ্যাস বশে কাজ করে যাচ্ছেন। নইলে ওঁর কি খাটবার অবস্থা আছে? আমারও রোজগার হচ্ছে না, বিশ রকম তোর বায়না কুলিয়ে বেরুই কখন? বড় হয়ে যা খোকন শিগগির শিগগির।...চাকরি-বাকরি করে হ্যাট মাথায় দিয়ে খোকন বাবু তো বাড়ি আসছেন! মা, পুজোয় তোর জন্য জামা-কাপড় নিয়ে এসেছি—আর দাদুর এই তসরের জোড়, তসর পরে দাদু পুজোয় বসবেন। আহা, এত বয়সের মধ্যে আহ্লাদ করে কেউ কিছু দেয়নি তোর দাদুকে। তসর পেয়ে বড্ড খুশি হবেন—বকবেন না, কত ভালবাসবেন তোকে দেখিস।

ভেবে চিন্তে মনোরমা গুহ সাহেবের বাড়ি গেল। পনেরটি টাকা অন্ততপক্ষে—ফটিকের এক মাসের ভাড়া—মঞ্জুবউয়ের কাছে হাওলাত চাইবে। এক মুশকিল—হাওলাত নিয়ে এলে আবার কি ফেরত নেবে ঐ টাকা? মঞ্জু-বউর মেয়ে যায়-যায় হয়েছিল ও-বছর—যমের সঙ্গে টানাটানি দু-মাস ধরে। মঞ্জুবউও শয্যাশায়ী। যম পরাজয় মানল শেষটা—মায়ের বুকের ধন মায়ের কোলে সে তুলে দিয়ে এলো। মঞ্জুবউ সজল চোখে হাত ধরে বলেছিল, এ মেয়ে তোমার, আমি তোমার ছোট

বোন। বোন আর মেয়েকে দেখে যেও মাঝে মাঝে এসে। সম্পর্ক যেন শেষ হয়ে যায় না...

আজকে এক কাণ্ড হল খোকন। শোন্। মঞ্জু-বউর কাছে—না, টাকাকড়ির জন্য কক্ষণো নয়—এমনি গিয়েছিলাম। যেতে হয় রে, আলাপ-পরিচয় রাখতে হয়। এর বাড়ি থেকে ওর বাড়ি এমনি ভাবে পরিচয় বাড়াতে হয়—তবে তো লোকে ডাকবে আমাদের! হাসিস কেন রে হাসকুটে ছেলে—হাসলে আমি কিন্তু কিছু বলব না। আমি দুঃখধান্দা করব, আর যা বলতে যারো উনি হেসেই কুটিকুটি! কি হল শোন্ না রে—মঞ্জুবউর মেয়ে কি সুন্দর যে হয়েছে! সেই মেয়ে, যাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম। আহা, ঠোঁট ফোলাতে হবে না...কি হিংসুটে হয়েছিস তুই খোকা! ফুটফুটে রং হতে পারে, কিন্তু দেখতে কি আর তোর মতন! মাস দশেক বয়স তখন—বিছানার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল, সরু ক'খানা হাড় শুধু চামড়ায় ঢাকা। মঞ্জুবউরও উঠবার শক্তি নেই। তিন বছর পরে আজ গিয়েছিলাম। কত বড় হয়ে গেছে সেই খুকি, ফ্রক পরে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে! কত চেষ্টা করলাম, একটা বার কাছে এলো না। অথচ প্রাণ দিয়েছিলাম আমিই তো! ওর মা কি বলল জানিস? বলে, একেবারে সুহাসের রীত পেয়েছে। সুহাস হল মঞ্জুবউর স্বামী। বড়মানুষ ওরা, স্বামীর নাম ধরে ডাকে—স্বামীর কথা বলতে যেন গরবে ফেটে পড়ে। বলে, যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। ভারি সাফসাফাই—এক কণিকা ধুলো লাগতে দেয় না গায়ে বা জামা-কাপড়ে। তোমার ঐ যে ময়লা কাপড় দেখেছে।...মানে পাকে-প্রকারে ও-ই কোলে নিতে দিল না। ও যদি চেষ্টা করত, আসত না কি মেয়েটা? বয়ে গেল—তুই আমার কোল জুড়ে থাক খোকন। টাকা চাই নি আমি —বল্ তুই, ঐ ব্যাপারের পর টাকা চাইতে পারি মঞ্জুবউর কাছে? রাগ করে চলে এলাম।

খোকা বলে, উঁ—

কত বুদ্ধি-জ্ঞান খোকনের আমার, ভেবে চিন্তে তার পরে মতামত দেওয়া হয়! বটেই তো! সোজা ব্যাপার নয়—

ড্যাবড্যাব করে খোকা চেয়ে আছে—কত যেন বুঝছে! অবোধ্য ভাষায় দুঃখ করছে সে যেন। মনোরমা আরও আকুল হয়ে পড়ে, হু-হু করে জল ঝরে পড়ে দু-গাল বেয়ে।

কত ছেলেমেয়ে ধরলাম আজ অবধি! তাদের বুকে করে করে বাঁচিয়েছি। মা-বেটিরা কি করেছে—গদির বিছানায় পড়ে পড়ে কাতরেছে শুধু—তখন তো মা-ই আমি তাদের। সুস্থ হয়ে উঠে তার পর যে যার ঘর গুছিয়ে নিল—আমার আর তখন দরকার নেই। এত সংসার ভরে দিলাম—ভগবান, আমায় একটা সংসার দিলে না! দায়ে না পড়লে কেউ ডাকে না—গিয়ে দাঁড়ালেও চিনতে চায় না। মাংসের এক একটা দলা —কাদা দিয়ে পুতুল গড়ার মতো—নাকটা একটু টিপে কপালটা একটু চেপে ধীরে ধীরে তাদের মানুষের আকৃতিতে নিয়ে এলাম, তারা আমায় দেখে পলায়। পেত্নী-শাকচুন্নির গল্প শুনে থাকে, তারই হয়তো একটা ভাবে আমায়।

শেষ পর্যন্ত ফটিকই একটা ব্যবস্থা করে দিল। বাড়ি-ভাড়া আদায়ের চাড় আছে। বলে, এতগুলো টাকা বরবাদ হয়ে যাবার দাখিল। দেবে কোত্থেকে একটা উপায় জুটিয়ে না দিলে? ঐ যেমন অমরেশ বাবুর বেলায় হল—একখানা ভাঙা চৌকি আর খান চারেক ফুটো থালা-বাটিতে সমস্ত শোধবোদ।

মনোরমাকে বলে, ভাল কপাল তোমার! কাজ জুটেছে। যা তুমি করে বেড়াও, সে রকম দু-দিন পাঁচ দিনের ছেলে-ধরানি কাজ নয়। লক্ষপতি লোকের বউয়ের অসুখ। অসুখ হল হাঁপানি—সারেও না, মরেও না। লেগে যদি যায়—চাই কি চিরকাল ধরে চাকরি চলবে। সারাদিন এমনি বেশ থাকে—রাত হলেই রোগি শ্বাস টানতে আরম্ভ করে।

মনোরমা বলে, রাতে থাকা আমার পক্ষে যে মুশকিল—

রাতেই তো ভালো! বড়লোকের বাড়ি—ভাল খেয়ে-দেয়ে মজাসে ঘুমোবে। বড্ড চেঁচাচেঁচি করলে উঠে ঢুলতে ঢুলতে এক দাগ অষুধ খাইয়ে দেওয়া। ওর বেশি কোন্ নার্স কোথায় করে থাকে? সকাল হলে আর এক দফা চা-টা খেয়ে ডবল ফী আদায় করে নিয়ে বাড়ি চলে আসবে।

কিন্তু ছেলে—

আরে মোলো! আখের খোয়াবে তুমি পরের ছেলের জন্য?

মনোরমা ভাবল অনেক ক্ষণ। এমন কাজটা জুটিয়ে নিয়ে এসেছে, ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। সংসার অচল, কাজ না নিয়ে উপায় কি?

কবে থেকে ফটিক? যেতে কিন্তু খানিকটা রাত্রি হবে, ছেলে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তারপর বেরুব। একটু রাত করে যেন গাড়ি পাঠান—বলে দিও।

তাই হল। গলির মোড়ে মোটর হর্ন দিচ্ছে। কিন্তু ছেলের কি হয়েছে আজকে যেন, ঘুমোতে চায় না—কিছুতে ঘুমোবে না। ফটিক বারম্বার তাগিদ দেয়, হল তোমার? বড়লোক মানুষ—কতক্ষণ থাকবেন রাস্তার উপর পড়ে?

নিজে এসেছেন?

আসবেন না? তাই বললেন আমায়, বউ ছটফট করছে—হাঁপানি আজকে বড্ড বেড়েছে—এ তিনি চোখের উপর দেখতে পারলেন না। উদ্বেগে বেরিয়ে পড়েছেন। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আর দেরি কোরো না তুমি—

দেরি কি ইচ্ছে করে করছি? কাণ্ড দেখ—ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছে এখনো। এইও—চোখ বোঁজ্ বলছি। দেবো চোখে আঙুল পুরে। আমার সব দিক তুই নষ্ট করে দিলি।

রাগ করতে গিয়ে হেসে ওঠে মনোরমা।

না গো, মুখ ফোলাতে হবে না তোমার। বুদ্ধিটা দেখ ফটিক, সমস্ত

কেমন বুঝতে পারে।...তোমায়-আমি বলিনি কিছু। তুমি হলে সোনা মাণিক—তোমায় বলা যায় কিছু? বলেছি ফটিককে। বড় দুষ্টু ওটা।

ফটিক বিরক্ত হয়ে বলে, ঐ করো এখন বসে বসে। বাবু চটে যাচ্ছেন, চলে যান তিনি তা হলে—

মনোরমাও একটু উষ্ণ হয়ে বলে, চটলে আমি কি করতে পারি? ইচ্ছে করে তো দেরি করছিনে। বাবুকে বুঝিয়ে বলো একটু। তোমার ঘরে নিয়ে বসাও—

বিড়-বিড় করতে করতে ফটিক চলে গেল।

ছেলে ঘুমুল, তখন সাড়ে-আটটা বেজে গেছে। দোকান বন্ধ করে এসে জনার্দন আহ্নিকে বসেন। আহ্নিক শেষ হয়েছে এইমাত্র। বাপকে সমস্ত ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে মনোরমা বেরিয়ে পড়ে। কয়েক পা গিয়ে আবার নতুন কথা মনে পড়ে।

উঠে উঠে কাঁথা বদলে দিতে হবে বাবা। খেয়াল রেখো। ভিজে কাঁথায় থাকলে অসুখ করবে।

জনার্দন রাগ করে বলেন, লাট সাহেবের বাচ্চা কিনা—আঙুরের মতো সামান করে তুলোর বাক্সে রাখতে হবে। যাচ্ছিস, তাই চলে যা। অত কিসের?

গাড়িতে উঠে মনোরমা অবাক হল। ফটিক নাম বলে নি—দামোদর বাবু—দামোদর মান্না। লক্ষপতি বলে পরিচয় দিয়েছিল—লক্ষপতি বললে ছোট করা হয়, অনেক লক্ষ আছে ব্যাংকে। এই বস্তির জমি এবং শহরের উপর আরো বহু জমি ও বাড়ির মালিক। দামোদরের ছিটে-ফোঁটা প্রসাদ পেয়েই ফটিক এমন মাতব্বর।

হু-হু করে ছুটেছে গাড়ি। গাড়ির ভিতর আবছা আঁধার। পথ জনবিরল। মনোরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সহসা গায়ের উপর একটা হাত এসে পড়ায় চমকে উঠল।

সরে বসুন—

কেন রে, কি হয়েছে?

কঠিন স্বরে মনোরমা বলে, তর্কে কি হবে? যা বললাম, ওপাশে সরে গিয়ে বসুন—

ভালো রে ভালো! আমার গাড়ির মধ্যে তুই বসে হুকুম চালাবি?

গরিব আছি বলে অমন তুই-তোকারি করবেন না—

হুজুর-জাঁহাপনা বলতে হবে নাকি রে? ঢং রেখে দে, ঢের ঢের দেখা আছে আমার।

তবে বাবু গাড়িটা রুখতে বলুন। ড্রাইভারের পাশের সিটে গিয়ে বসব।

আমি লোক খারাপ—আমার পাশে ছারপোকা কামড়ায়? আর ড্রাইভার ঋষিতপস্বী—এই বলতে চাচ্ছ?

ঋষিতপস্বী কেন হবে—গরিব লোক, ছোটলোক। তাই বড়লোক মনিবের সামনে ইতরামি করতে সাহস করবে না।

দামোদর অগ্নিশর্মা হলেন।

এত বড় কথা! ইতর বলা হল আমাকে? জানিস, আমি যাচ্ছে-তাই করতে পারি এখানে। ড্রাইভার আমার চাকর—তাকে ডরাই নাকি? যা করব সে মুখ বুজে দেখবে—টুঁ শব্দ করবে না।

কিন্তু আমি চেঁচাব। লাফিয়ে পড়ব গাড়ি থেকে। আপনাকে খুনের দায়ে ফেলব। স্ত্রী হাঁসফাস করছেন, প্রাণ তাঁর কণ্ঠাগত—ছি-ছি, মানুষ না জানোয়ার আপনি? এই ড্রাইভার, গাড়ি থামাও। থামাও বলছি—

শহরতলী জায়গা—যুদ্ধের সময় মিলিটারির দখলে ছিল, এখন নতুন শহর গড়ে উঠছে। দশ-বিশটা বাড়ি উঠেছে—বসতি জমে নি এখনো। এই প্রহরখানেক রাতেই নিষুপ্তি চারিদিকে। পায়ে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। তা আবার রাস্তায় আলোর অভাব। এতদূর অন্ধকার পথ অতিক্রম করে একাকী চলে আসা মনোরমা বলেই পেরেছে।

বাবা—

জনার্দনের ঘুম এসেছিল, ধড়মড়িয়ে উঠলেন। খিল খুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাতের আন্দাজ নিলেন।

এরই মধ্যে এলি?

কণ্ঠ তিক্ত হয়ে উঠল। বললেন, ছেলে রেখে গিয়ে সোয়াস্তি নেই? ভরসা হয় না আমার কাছে? ঐ ছেলে শেষ করবে আমাদের।

মনোরমা আকুল হয়ে বলে, ঝি-গিরি করব বাবা, বাড়ি বাড়ি কাপড় কেচে বাসন মেজে বেড়াব। এমন কাজে আর নয়।

হারিকেন টিপ-টিপ করছিল। জোর বাড়িয়ে দিয়ে জনার্দন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হলেন।

কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

ফটিকের লোক বাবা, দামোদর মান্না। চেঁচামেচি করে আমি মোটর থেকে নেমে এসেছি।

জনার্দন আর একটি কথাও না বলে দোকান-ঘরে ঢুকলেন। ঐ ঘরে থাকেন তিনি। এ ঘরে মনোরমা আর ছেলে।

এইবার খোকার দিকে নজর পড়ল। আরে সর্বনাশ—ভাগ্যিস মনোরমা এসে পড়েছে! ছেলে বিছানা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে স্যাঁৎসেঁতে মেজেয় পড়ে আছে। সারা রাত এমনি থাকলে রক্ষে ছিল? বাবার তা হুঁশ নেই। তাই তো দেখা যাচ্ছে—বুড়ো আর বাচ্চা একই রকম। একের ভার অন্যের উপর দিয়ে গেলে এমনি দশা ঘটে।

অনেক রাতে কখন চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে বারান্ডার উপর—সেখান থেকে জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে, যেখানে ছেলে নিয়ে মনোরমা ঘুমুচ্ছে। সমস্ত বেদনা-অপমান মুছে গেছে ছেলে বুকের ভিতর আঁকড়ে ধরে, নিশ্চিন্ত আরামে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যে যেন কানে এল, নাম ধরে অনুচ্চ কণ্ঠে বারম্বার কে ডাকছে।

চোখ মেলে মাথা কাৎ করে দেখতে পেল জনার্দনকে। জনার্দন বলেন, দরজা খোল্—

সাড়া দিল, উঁ—

ঘরের মধ্যে এসে চুপি চুপি বলেন, কাঁথা-বালিশগুলো বেঁধে নে তাড়াতাড়ি।

মনোরমা কিছুই বুঝতে পারছে না, বিস্মিত চোখে তাকাল। জনার্দন বলেন, দোকানের জিনিসপত্তোর পাচার করে দিয়ে এসেছি আমার এক গুরুভাইর বাড়ি। রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি অবধি সরিয়েছি। এই তো করছি সেই তখন থেকে। তোর ঘরের এইগুলো শুধু বাকি।

মনোরমা বলে, পালাচ্ছি আমরা?

নয় তো কি রক্ষে রাখবে? ফটিকের মতলব বানচাল করে এসেছিস—সকাল বেলা যখন টের পাবে, সকলের আগে আমাদের জিনিসপত্তোর আটকাবে। দোকানে হয় না হয় না—করেও নুন-ভাতটা তবু জুটে যাচ্ছে। দোকান গেলে খাব কি?

একটুখানি চুপ করলেন। বলেন, আর ভাবছিলামও অনেক দিন থেকে, এ-পাড়ায় ছবির খদ্দের নেই—ভাল জায়গা কোনখানে উঠে যেতে হবে।

অনেক দূর এসে গেছে তারা—একেবারে ভিন্ন অঞ্চলে। ভোরের বেশি দেরি নেই। এতক্ষণে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে জনার্দন বলেন, আর ফটিকের তোয়াক্কা রাখিনে। ভেবেছে কি শয়তান বেটা—ঘর দিয়ে মাথা কিনেছে? গরিব বলে তাই এমনি ব্যাভার!

গলা বুঝি ধরে আসে। মনোরমা কথা ঘুরিয়ে নেয়।

গরিব বলেই তো হ্যাঙ্গামা কম হল বাবা—জিনিসপত্তোর অত সহজে সরিয়ে ফেললে। কোনদিন যে ওখানে ছিলাম, সকালবেলা কেউ তার চিহ্ন দেখতে পাবে না।

মাস দুয়েক অমরেশ হাসপাতালে ছিল। তার পর থেকে জয়ন্তীর বাড়ি। বেশ আছে—নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব। চেহারা ভাল বরাবরই—ইদানীং স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে, গায়ে রঙের জৌলুষ খুলেছে।

একটা ভাবনা আসে মাঝে মাঝে—ছেলেটার কি হল? মরে গিয়ে থাকে তো ভালোই—সকলের পক্ষে। নয় তো মনোরমার ঘাড়ে চেপে রয়েছে। বেশ হয়েছে, টাকার জন্য আটকেছিলে—বোঝ এখন মজা। অমরেশ সে বস্তু নয় যে হাহাকার করে গিয়ে পড়বে সজীব ঐ মাংসপিণ্ডটুকুর জন্য—ছেলের নামে আর দশজনা যেমনটা করে থাকে। গদ-গদ হবার কি আছে—আক্রোশ বরঞ্চ ছেলেরই উপর, রেবা মারা গেল যার কারণে।

গাদা গাদা ফল-মিষ্টি নিয়ে জয়ন্তী হাসপাতালে যেত। অমরেশ বলত, এত কেন? বিশ জনে খেয়েও যে ফুরোতে পারে না—

জয়ন্তী বলত, তা আছেও তো ওদিকে বিশের অনেক বেশি। পড়ে থাকবে না, ফুরিয়ে যাবে।

নিকটে দূরে রোগিগুলোর উপর উৎসুক দৃষ্টি বুলিয়ে বলে, তুমি এখানে ছিলে—সেই কথা মনে রাখবে ওরা চিরকাল।

মনে থাকবে চিরকাল আমারও। ভাঙা পা আর খাড়া হবে না—পঙ্গু হলাম চিরদিনের মতো।

জয়ন্তী শুনেও শোনে না—ফল কাটছে, খাবার সাজাচ্ছে।

খোঁচাটা প্রকট করবার অভিপ্রায়ে অমরেশ আবার বলল, তোমার খেয়ালের জন্যই জয়ন্তী। কুক্ষণে নৌকো বাইতে গেলে—

নিস্পৃহভাবে জয়ন্তী বলে, হয়েছে কি তাতে? পূর্বপুরুষের ল্যাজ ছিল মাছি তাড়াবার জন্য। ল্যাজ খসে গেছে আমরা অন্য দিক দিয়ে সক্ষম হওয়ায়। এত রকম-বেরকমের গাড়ি বেরিয়েছে—বিজ্ঞান যুগে এখন পায়ের দরকারটা কি বলতে পারো?

পা সকলের, গাড়ি আর ক'জনের?

অন্তত তোমার একখানা হওয়া উচিত, পা গেছে যখন।

ব্যঙ্গের সুরে অমরেশ বলে, দেবে নাকি তুমি? তা হলে অবশ্য দুঃখ করা সাজে না। একটা পায়ের জন্য হাজার বারো-চোদ্দর গাড়ি—ভাল দাম বলতে হবে বৈ কি!

আচ্ছন্ন করে রেখেছে জয়ন্তী এই মাসগুলো। মুহূর্তের ফাঁক

দেয় না যে, নিরিবিলি অমরেশ অবস্থাটা পর্যালোচনা করে দেখবে। এই গান গাচ্ছে, এই গল্প বা তর্ক জুড়ে দিয়েছে...তাস খেলছে ..একটা বই পড়ে শোনাচ্ছে। অথবা নিয়ে বেরুল গাড়ির ভিতর পুরে। গাড়ি তখন ড্রাইভারে চালায়, সে অমরেশের পাশে বসে বকবক করে। গাড়ি চালাতে গেলে অনর্গল বাক্যবর্ষণ চলে না, তাই জয়ন্তী ইদানীং গাড়ি-চালানো ছেড়ে দিয়েছে।

পৌষ মাসের শেষে আশুতোষ সদরে ইরশাল করতে এলেন। নিজের আসার প্রয়োজন ছিল না, নায়েব-মুহুরিদের দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলত। কিন্তু সেই মফস্বল মৌজা অবধি নানাবিধ রটনা পল্লবিত হয়ে পেঁৗছেছে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে তাই নিজে এসে পড়েছেন। ইতস্তত করলেন খানিকটা, নানা দিক দিয়ে ভেবে দেখলেন। কিন্তু যতই হোক, সম্পর্কে মামা তো বটে—নির্বিকার ঔদাসীন্যে চক্ষু বুঁজে থাকেন তিনি কি করে?

এত বড় বাড়িতে এক-একা থাক কি করে মা? একটা-দুটো দিনের জন্য এসেই আমরা হাঁপিয়ে উঠি।

জয়ন্তী হাসিমুখে বলে, একা কোথায়? কতই তো লোকজন! চাকরে আর দরোয়ানে মিলে কতগুলো হয়, সেইটেই শুধু হিসাব করে দেখুন না।

আশুতোষ স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলেন, বাজে লোক দিয়ে কি হবে? সর্বক্ষণের সাথী চাই যে একজন—

তা-ও আছে। রাত-দিনের জন্য রোহিণী রয়েছে। বাইশ টাকা হাতখরচ পায়—কিন্তু ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

আশুতোষ বলেন, এত বিষয়-সম্পত্তি ঘর-বাড়ি, এমন রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি—তা ঐ রোহিণী-ঝি নিয়েই কাটিয়ে দেবে নাকি? বলি, বিয়েথাওয়া করতে হবে না?

নিশ্বাস ফেলে বলেন, মিত্তির মশায় বর্তমান থাকলে কাউকে কিছু

ভাবতে হত না। তাঁর কত রকম সাধ দিল! আমাকেই শুধু খুলে বলতেন মনের কথা।

বাপের কথা মনে পড়ে জয়ন্তীর কষ্ট হয়। বলে, মা কোন ছেলে-বেলায় গেছেন। বাবাও গেলেন। বেশ তো আছি—কি দরকার, বলুন, আর হাঙ্গামা জড়িয়ে?

শোন মেয়ের কথা! তাঁরা গেছেন, এই বুড়ো হাড় ক'খানা এখনো খাড়া আছে। তার উপরে তোমার মামী—সে তো এদেশ-সেদেশ ঘোড়-দৌড় করাচ্ছে আমায় দিয়ে।

জয়ন্তী বলে, না মামা, দরকার নেই, এদেশ-সেদেশ করে—

দরকার তোমার না থাক, আমাদের আছে যে! হীরের টুকরোর মতো একটি ছেলে চাই যে আমাদের নতুন বাপ হয়ে মাথার উপর বসবে।

জয়ন্তী জেদ ধরে বলে, তা সে যা-ই হোক—বুড়ো মানুষ আপনাকে দৌড়ঝাঁপ করিয়ে মেরে ফেলতে দেবো না। ঘরে যা আছে, তাইতে মামীর খুশি হতে হবে।

ঘরে কে আবার?

আশুতোষ ইচ্ছে করেই অজ্ঞতা দেখাচ্ছেন। নইলে কে সেই মানুষটা পথের ফকির হয়ে রাজতক্তে বসতে যাচ্ছে—তা কি আর জানেন না? কানাঘুসো যা শুনেছিলেন, মুখের উপর কালামুখী নিজে সেটা প্রকাশ করে বলছে। এতখানি নির্লজ্জতা স্বপ্নে কেউ ভাবতে পারে না। কিন্তু একেবারে স্পষ্ট করে না বলা পর্যন্ত আশুতোষও আমল দেবেন না।

হতবুদ্ধির ভাবে আশুতোষ বললেন, কার কথা বলছ মা-জননী?

এতক্ষণ বসে বসে আলাপ করে এলেন যার সঙ্গে—

ঐ খোঁড়াটা?

আকাশ থেকে পড়েছেন যেন তিনি।

খোঁড়ার হাতে মেয়ে দেবো দেখে শুনে?

দেখে শুনেই তো দেবেন। খোঁড়া ছিল না—আপনাদের মেয়ে খোঁড়া করেছে। তাতে দায়িত্ব বর্তাচ্ছে।

দৈব দুর্ঘটনা—এমন কতই হচ্ছে অহরহ। জামাই করে তার দায়িত্ব শোধ করতে হবে—ভালো রে ভালো!

জয়ন্তী জবাব দিল না, টিপি-টিপি হাসছে।

আশুতোষ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে বলেন, সত্যি সত্যি বিয়ে করবে ওকে—না, ভয় দেখাচ্ছ বুড়োকে?

জয়ন্তী সংশোধন করে বলে, বিয়ে হবে আমাদের। অমরেশ রাজি হয়েছে।

আশুতোষ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, রাজি হয়েছে তো মিত্তির মশায়ের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল। ও পাগল ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়? হ্যাংলাটা তো কড়ে-আঙুল বাড়িয়েই আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন রুচিতে তুমি মা ওটাকে পছন্দ করলে?

জয়ন্তী বলে, আপনার যে জামাই হবে তার সম্বন্ধে এমন করে বলা কি ঠিক হচ্ছে মামা? বিশেষ করে যে তার স্ত্রী হতে যাচ্ছে, তারই মুখের উপর—

একেবারে পাকাপাকি হয়ে গেছে? এতখানি আমি বুঝতে পারি নি। সুর নরম করে আশুতোষ বলতে লাগলেন, তা বেশ! সুখী হও, বেঁচেবর্তে থাকো। তবে কিন্তু মা, আমায় এর মধ্য থেকে ছেড়ে দিও। স্বর্ণপ্রতিমা গাঙের জলে বিসর্জন যাবে, এ আমি চোখে দেখতে পারব না।

জয়ন্তী কঠিন হয়ে বলে, গাঙ তবু অনেক ভালো। পচা ডোবায় পড়তে হল না—

পচা ডোবা বলছ কাকে?

আপনার শালার ছেলে। বার পাঁচ-সাত চেষ্টা করেও যে আই-এ-টা পাশ করতে পারল না।

কিন্তু চেহারায় চরিত্রে আলাপ-আচরণে অমন আর একটি খুঁজে

বের করো দিকি। চাকরি করে খেতে হবে না—কোন দুঃখে বিদ্যের বোঝা বয়ে মরবে?

একটু থেমে আবার বলেন, আর বিদ্যে হলেই যদি মন ওঠে, বেশ তো, বিদ্বানও আছে—

আপনার ভাইপো রণধীর বোধ হয়। সেকেণ্ড ক্লাশ সেভেন্থ। আর অমরেশ সেই বছরেই ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড।

আশুতোষ রাগতভাবে বললেন, ভাইপো-ভাগনে আমার আপন লোক—তাদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু শুধু দুটিমাত্র তো নয়—ঢের ঢের ভাল ছেলে আছে বাজারে। ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্টও আছে।

রোহিণী এসে দাঁড়িয়েছে। আশুতোষ ঝি বলে পরিচয় দিলেও ঠিক ঝি নয়। জয়ন্তীদের দূর-সম্পর্কিত পূর্ব-বাংলা ছেড়ে-আসা একটি মেয়ে।

রোহিণী টিপ্পনী কাটল, অন্য ছেলের কি দরকার মামা, একজনের সঙ্গে ছাড়া বিয়ে হয় না যখন?

জয়ন্তী খিল-খিল করে হেসে ওঠে। আশুতোষ রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকান ডেঁপো মেয়েটার দিকে। কিন্তু জয়ন্তীর সখিস্থানীয়—ভয় পাবার মেয়ে নয় সে-ও। বলে, চুপি চুপি আরও একটা খবর বলি মামা। ওটা এ্যাকসিডেণ্ট নয়, পুরোপুরি ষড়যন্ত্র। নৌকোয় নৌকোয় লাগিয়ে জয়ন্তী অমরেশ বাবুর পা ভেঙে দিল, যাতে তিনি আর কোথাও পালিয়ে যেতে না পারেন।

আশুতোষ রাগ করে বলেন, যা ইচ্ছে করোগে তোমরা। আমি ও-বিয়ের মধ্যে নেই।

জয়ন্তী বলে, ঝেড়ে ফেললে হবে কেন মামা? আপনি ছাড়া কে আছে বলুন মাথার উপরে?

মামা বলে কি খাতিরটা রাখলে? মুখের একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছ?

জয়ন্তী মেনে নেয়।

অন্যায় হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করা একশ'বার উচিত ছিল ব্যাপার শুনে আপনিই তখন বলতেন, তা আর কি হবে—হোক ওর সঙ্গে বিয়ে। আমায় কিছু বলতে হত না, আপনার মুখ দিয়েই বেরুত। এই এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার—ঠিক সময়ে ঠিক বুদ্ধিটা কিছুতে মাথায় খেলে না।

আরও নরম হয়ে বলে, তবু তো মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে! ঘাট মানছি—আমার জীবনের এমনি ক্ষণে কিছুতে আপনি ক্ষোভ পুষে রাখতে পারবেন না।

আশুতোষ বললেন, ঝোঁকের মাথায় এত বড় কাজটা করতে যাচ্ছ—কিন্তু ওর সম্পর্কে চিরদিন এমনি মনের ভাব থাকবে, জোর করে বলতে পারো?

তা ঠিক, কিছুই বলা যায় না মামা। আজকের ভাবনাই শুধু ভাবতে পারি আমরা। আজ মনের মধ্যে এক তিল ফাঁকি নেই। এই তো ঢের—এই বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে, ভেবে দেখুন।

বিয়ে-বাড়ি আত্মীয়-কুটুম্বে ভরে গেল। জয়ন্তী আর একেশ্বরী নয়—বাড়ির ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। নানা সম্পর্কের নানা জনে এসে হুকুম-হাকাম চালাচ্ছে। পুরোপুরি বিয়ের কনে হয়ে দাঁড়িয়েছে, বড়রা যা বলছেন নিঃশব্দে তদনুযায়ী চলা তার কাজ। এ এক বিচিত্র অনুভূতি—ছোট হয়ে সকলের আদেশ মাথায় নিয়ে বেড়ানোর অপরূপ আনন্দ। বাড়ির মধ্যে ইদানীং তার কোন কথাই থাকছে না, সে-ও কিছু বলতে যায় না কাউকে।

অমরেশকে চালান করে দেওয়া হয়েছে ভিন্ন পাড়ার এক ভাড়াটে বাড়িতে। সেখানে সে বর হয়ে আছে। মোটর চড়ে কিছু বরযাত্রী সঙ্গে নিয়ে ঐখান থেকে বিয়ে করতে আসবে। বিয়ের পরে বউ নিয়ে তুলবেও ওখানে। উৎসব একেবারে মিটে গেলে তার পর জোড়ে

ফিরে আসবে। অনেক দিনের পর আবার সে স্বাধীনতা পেয়েছে—জয়ন্তীর পাহারা ঘিরে নাই তাকে। আহা, বড় মিষ্টি পাহারাদার জয়ন্তী! জয়ন্তীর অভাবে অসুবিধা পদে পদে, তার উপর কতখানি সে নির্ভরশীল, এই ক'দিনে ভাল করে টের পাচ্ছে। তা হোক, আনন্দও আছে মুক্তির মধ্যে। চিরবন্দিত্বের আগে এই অবসরটুকুতে অঞ্জলি ভরে মুক্তির স্বাদ নিয়ে নিচ্ছে।

এরই মধ্যে এক সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে অমরেশ বেরিয়ে পড়ল। ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। জয়ন্তী কনে হয়ে ও-বাড়ি আছে, তাই রক্ষা। সে থাকলে এমন একা হতে পারত না। পাশের জায়গাটি জুড়ে বসে থাকত।

গাড়ি এসে থামল তার সেই পুরানো পাড়ায়।

জনার্দনের ছবির দোকান নেই, সেখানে মুদিখানা খুলেছে—নুনতেল ডাল-মশলা মেপে মেপে দিচ্ছে খদ্দেরদের। সামনের ডাক্তারখানায় করালী ডাক্তার একা বিশটা রোগির মহড়া নিচ্ছেন। চিকিৎসা নয়, চিৎকার। রোগিরা যেন পরম শত্রু—ষড়যন্ত্র করে তাঁর শান্তি বিঘ্নিত করতে আসে।

ডাক্তার বাবু, অসুখ তো সারে না—

অষুধে সারে না অসুখ। কেন আসিস জ্বালাতন করতে? বাড়িতে ভালমন্দ খা গিয়ে ঐ পয়সায়।

কোণের বুড়ো লোকটা ফোঁস করে ওঠে।

সারে না, কি বলো ডাক্তার? বাজে ধাপ্পা দিও না, ভাল হবে না। আমার ছোট মেয়েটা দেড় বছর জ্বর-পিলেয় ভুগে ভুগে যাবার দাখিল হয়েছিল, তোমার রাঙা অষুধের এক দাগ যেই মাত্তোর পেটে পড়া—

করালী ডাক্তার চটে ওঠেন। কি বলো তুমি? অষুধই নয় ওটা আদপে। কলের জলে পঞ্চানন একটু করে আলতা গুলে দেয়।

অমন মিষ্টি-মিষ্টি হয় তবে কি করে? তোমার অষুধ ঘরে রাখবার জো নেই। যার অসুখ নয়, চুরি করে সে-ও এক দাগ খেয়ে ফেলে—

এই সর্বনাশ করেছে! পঞ্চানন তুমি ওতে আবার সিরাপ ঢালছ নাকি?

পঞ্চানন কম্পাউন্ডার বলল, আপনিই তো সেদিন—

খবরদার বলছি, এবার থেকে কুইনিন মিশিয়ে দিও। কিম্বা নিম-পাতা-সিন্ধ—যাতে অন্নপ্রাশনের ভাত অবধি বেরিয়ে আসে।

ক্রাচে ভর দিয়ে অমরেশ এমনি সময় ধীরে ধীরে এসে ঢুকল। সবিস্ময়ে করালী চেঁচিয়ে ওঠেন।

বেঁচে আছ? ইস, কোন্ ডাকাতের আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলে গো?

রোগিদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ডাক্তার নয় তো ডাকাত। দেখ্ তোরা—কি করি আমরা। হাত কাটি, পা কাটি, পেটের মধ্যে ছুরি চালাই—

অমরেশ বলে, অনেক কিছুই করেন; পরিচয় দিতে হবে না। এ পাড়ার সকলে তা জানে। টাকা ষাটেক নেওয়া আছে আপনার কাছ থেকে—সেটা ফেরত দিতে এসেছি। আর যা দিয়েছেন, সে দেনা শোধ হবে না ইহজন্মে।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নেন। একবার তার বেশভূষা এবং একবার বাইরে মোটরখানার দিকে তাকিয়ে বললেন, বড়লোক হয়ে গেছ দেখছি—

এই খোঁড়া হয়ে যাওয়ার কল্যাণে।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, সমস্ত দানছত্তোর করে দিয়ে বিবাগী হয়ে তুমি বেরিয়ে পড়েছ—

অমরেশ বলে, ভুল শুনেছেন ডাক্তার বাবু। পাওনাদাররা সমস্ত কেড়েকুড়ে নিল। ফটিক নিল বাসন-তক্তাপোশ, মিসেস পালিত নিলেন ছেলে। আচ্ছা, মিসেস পালিত কোনখানে থাকেন, ঠিকানা বলতে পারেন ডাক্তার বাবু?

করালী বললেন, রাতারাতি পালিয়ে গেছে। ছেলে খালাস করতে

এসেছ বুঝি? সে হবে না। অতি হতভাগা তোমার ছেলে। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মা-টিকে তো সাবাড় করল। এখন তোমার অবস্থা ভাল—নিয়ে গিয়ে আদরে যত্নে রাখতে পারতে। কিন্তু কোথায় পাবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হলেন করালী ডাক্তার।

বেঁচে আছে কি মরেছে কে জানে? হয়তো বা না খেয়ে শুকিয়ে খতম হয়ে গেছে। শেষটা যা অবস্থা হয়েছিল ওদের! ছবিতে ছবিতে, ঐ দেখ, ডাক্তারখানার দেয়াল ভরে ফেলেছি। জীবনে ঠাকুর-দেবতার ছায়া মাড়াই নি—নির্ঘাৎ তো নরকে নিয়ে ঠাসবে—সেই মানুষের ঘরে, দেখ, কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ধূমাবতী—তেত্রিশ কোটির মধ্যে বড় বেশি বাকি নেই। কি করা যাবে? জনার্দনের খদ্দের হয় না—এই সব ছবি আর এই ঢঙের বাঁধানো পছন্দ নয় আজকালকার। শেষটা আমিই তার একমাত্র খদ্দের হয়ে উঠলাম।

সন্ধান পাওয়া যাবে না, অমরেশ আগেই বুঝতে পেরেছিল। হাসপাতাল থেকে লেখা চিঠি আবার তারই কাছে ফেরত গিয়েছিল, সেই থেকে জানে। তবু একটিবার নিজে এসে জেনে শুনে যাওয়া। মনকে চোখ ঠারা—না হে, মানুষের যতদূর সাধ্য সমস্ত করেছি আমি। ভালই হল, জীবনের কয়েকটা বছর বিধাতাপুরুষ রবার দিয়ে ঘষে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়েছেন। একেবারে নবজাতকের মতো নিঃসম্বল ও নির্বন্ধন ধরিত্রীর উপরে। জয়ন্তীর কোন দিন কোন ক্ষোভেরই কারণ ঘটবে না, চমৎকার হয়েছে!

ডাক্তার বললেন, ছেলের আশা ছেড়ে দাও। বাসন তক্তাপোশ খালাস করতে চাও তো ফটিককে ডেকে পাঠাই।

আজ্ঞে না। যেখানে আছি, এ সব বাজে আসবাব তোলা যাবে না সে জায়গায়। আচ্ছা, উঠলাম তবে—

আশুতোষই শুভলগ্নে কন্যা-সম্প্রদান করলেন। কন্যাকর্তার করণীয় অতিথিসজ্জনদের আদর-অভ্যর্থনাও করলেন তিনি।

পরদিন জয়ন্তী আশুতোষকে একান্তে নিয়ে বলল, আপনি কথা বলছেন না যে জামায়ের সঙ্গে?

বিয়ের কনে এতখানি নজর রেখেছে। আশুতোষ ধৈর্য রাখতে পারেন না, বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

উঃ, আজ যদি মিত্তির মশায় বেঁচে থাকতেন!

জয়ন্তী মৃদু হেসে বলে, নিয়তি—বুঝলেন মামা, আপনি আমি কি করতে পারি? তা হলে বরাসন আলো করে বসত আপনার ভাইপো কি ভাগনে। কিন্তু তা যখন হয়নি, যে বর হয়েছে তাকেই তো আদর-আপ্যায়ন করতে হবে?

আশুতোষ বললেন, এ যেন হুকুমের মতো হল—

মুখের হাসি নিভে গিয়ে জয়ন্তীর স্বর কঠিন হয়েছে। বলল, হুকুম নয়, কর্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছি।

যেমন একদিন বোঝাচ্ছিলে, বাঁধের মাটির হিসাব কেমন করে রাখতে হয়?

ঠিক তাই। সেদিন বুঝিয়েছিলাম এষ্টেটের ব্যাপারে কর্মচারীর কর্তব্য, আজকে বোঝাচ্ছি সামাজিক ব্যাপারে মাতুলের কর্তব্য। বিয়ে যখন হয়ে গেছে, আর মুখ বেজার করা বোকামি। এইটেই মনে করিয়ে দিলাম আপনাকে।

চার বছর কেটেছে। ভারি বিপদ গেল ও-বাড়ির উপর দিয়ে। জয়ন্তী বিছানায় একেবারে লেপটে গেছে—মিন-মিন করে কথা বলে, পাশ ফিরে শোবে এমন শক্তিটুকুও বোধ করি নেই। প্রাণচঞ্চলা মেয়েটির এখন এমনি দশা!

অমরেশের এবার শিয়রে বসে থাকবার পালা। দরকার না থাকলেও জেগে বসে থাকে। আশঙ্কার অবস্থা পার হয়ে গেছে। ডাক্তার বলে-

ছেন, রোগিণী পর পরই ভাল হয়ে উঠবে। এতদিনে নিশ্চিন্ত হাসি ফুটেছে সকলের মুখে।

রোহিণী একদিন বলল, এক মুহূর্ত ক্লান্তি আসে না, এক পলক ঘুম পায় না—দেখালেন বটে অমরেশ বাবু সেবা বলে কাকে!

অমরেশ বলে, খোঁড়া মানুষ—বাইরে যাওয়া ঘটে না, ঘরেই পড়ে থাকি। রাতদিন পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি। চার বছরে এত ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছি যে চার পুরুষ আর ঘুমের দরকার হবে না।

জয়ন্তী ক্লান্ত হাস্যে চেয়ে দেখে অমরেশকে। গভীর আনন্দ ও ভালবাসায় অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে আবার তার চোখের পাতা নেমে আসে।

চোখ বুজে কিন্তু অন্ধকার নয়—পরমসুন্দর এক ছেলে। এ কি ছেলে হয়েছে রে—ধবধবে সাহেবের মতো রং, ছোট ছোট হাত-পা—ও মা, একটা দাঁতও বুঝি বেরিয়েছে নিচের মাড়িতে। ঐ একখানা দাঁতের দেমাক কত! হাসির ছল করে দাঁত বের করে দেখানো হয়।... তারই ছেলে এ কি? কতটুকু বা দেখতে পেয়েছিল জয়ন্তী, আর কি-ই-বা দেখেছিল! ফরসেপের চাপে পিষ্ট-মাথা বীভৎস এক ভ্রূণ—রক্তস্রোতের মধ্যে মাংসের একটা তাল। তার পরই সে চেতনা হারাল।

চিকিৎসা সমারোহে চলেছে। আত্মীয়বর্গ যে যেখানে ছিলেন, খবর পেয়ে এসে পড়লেন। রোগিণীর ঘরের বাইরে সে-ও এক তুমুল কাণ্ড—দীয়তাং ভুজ্যতাং চলেছিল সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি। এখন ভিড় পাতলা হয়েছে, আত্মীয়েরা যে যার কোটে ফিরে গেছেন। যান নি সপরিবারে আশুতোষ। আর দশজনের মতো উড়ো সম্পর্ক নয় তো তাঁর সঙ্গে—একবারে পরিপূর্ণ সুস্থ না করে যাবেন তাঁরা কি করে?

রোহিণী বলছিল, নমস্য আপনি অমরেশ বাবু। পতিব্রতার ছড়াছড়ি পুরাণে ইতিহাসে। পত্নীব্রতর নাম শুনিনে। এবার এই দেখলাম বটে!

বাইরে আশুতোষের কানে গেল। স্ত্রীর দিকে চোখ টিপে বলেন, শুনছ গো—খোশামুদির বহরটা দেখ। পথের ফকিরকে রাজতক্তে এনে তুলেছে—করবে না সে সেবা? অষুধ খাইয়ে বাতাস করে গায়ে হাত বুলিয়ে খাড়া করে না তুললে আবার যে পথে নামতে হবে। তার উপরে ঠ্যাং এখন একখানা মাত্তোর—ভাঙা ঠ্যাংটা দেখিয়ে দেখিয়ে ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় নেই। ছেলেটা বেঁচে রইল না যে বউ অন্তে তার নামে বিষয় ভোগ করবে।

নবদুর্গা ভ্রূকুটি করে ঘরের দিকে চেয়ে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে, অত ঘেন্না ছেলেপুলের উপর—ছেলে বাঁচবে ওর? কেন্নো আর আরশুলো—গা শির-শির করে নাকি বাচ্চা ছেলে কাছে গেলে! শোন কথা একবার। ওরা দেবতা—বুঝতে পারে সমস্ত। পেটে এলো তো কোলে গেল না। জ্বালা দিয়ে গেল—বুকের মধ্যে দাউ-দাউ করবে চিরজীবন। চোখ মুছিস কেন, বোঝ্ এবার।

কিন্তু জয়ন্তীর সামনে নবদুর্গার মুখের কথা একেবারে উল্টা রকমের।

তা কি হয়েছে! ডালে যে ক'টি ফল ধরে সব কি ঘরে আসে মা. ঝরে যায়—পড়ে যায়। এই তো সবে শুরু! কোল-কাঁকাল ভরে যাবে মা-ষষ্ঠীর বরে। ওর জন্যে দুঃখ কোরো না, আপদ-বালাই এসেছিল —বিদেয় হয়ে চলে গেল। তোমার যদি হত, ঠিক তবে বজায় থাকত।

কিন্তু জয়ন্তী জানে, এই শেষ। ডাক্তার বলেছিলেন, দুটো বাঁচবে না—মা অথবা ছেলে। জয়ন্তীর ইচ্ছে করছিল, চিৎকার করে বলে— ছেলেই বাঁচান তবে। বলেনি কিছু, বললেও কেউ শুনত না। যা হবার, হয়ে গেল তাই। নবদুর্গার মনের কথাটাই অহোরাত্র এখন জয়ন্তীর মনে বিঁধছে। ছেলেপুলে দূর-ছাই করত, তাই এমন হল —কোন দিন ছেলে আসবে না তার সংসারে...

বয়ে গেল, না এলো তো! বিশ্বসংসারে কত কাজ, কত মানুষ! জীবনের কত বৈচিত্র্য! বিছানা ছেড়ে বাইরে এসেছে জয়ন্তী। স্বাস্থ্য

ও রূপের প্লাবন এসেছে অকস্মাৎ, প্রাণপ্রাচুর্যে ঝিকমিক করছে। অমরেশ পর্যন্ত অবাক হয়ে যায়। এই সুন্দরী যৌবনোচ্ছলা যেন তার অনেকখানি অপরিচিত। ব্যর্থ জননী এ কোন উর্বসী হয়ে উদয় হল!

বেরুচ্ছি একবার। বন্ধুরা যাচ্ছেতাই করে বলে, ঘরকুণো হয়ে গেছি নাকি একেবারে! সত্যি, কতদিন যে ষ্টিয়ারিঙে হাত দিইনি!

যেন পটের পরী সেজে এসেছে। ঘর ভরে গেছে সৌরভের মাদকতায়। অমরেশও বিহ্বল দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। বলে, এতদিন বিছানায় কাটালে, বেরুবে বই কি! অসুখের সময়ে তোমার বন্ধুরা আসতেন—তোমারও যাওয়া উচিত এক-একবার সকলের বাড়ি।

একটু দ্বিধান্বিত ভাবে জয়ন্তী বলে, যাবে তুমি?

উঁহু, মেয়েদের মধ্যে আমি কি যাব! আমি সংকুচিত হয়ে থাকব। তাঁরাও।

কিন্তু একলাটি তোমার কষ্ট হবে যে!

কষ্ট কিসের? ঘরে বসে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। অভ্যাস তো করতেই হবে পা গেছে যখন।

জয়ন্তী কথা বাড়াতে চায় না।

বই পড়ো বসে বসে লক্ষ্মীটি। কেমন? সন্ধ্যার আগেই এসে পড়ব। এসে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবো আজ।

বাড়ি ফিরল তখন রাত্রি দশটা। বলল, তোমার বড্ড কষ্ট হয়েছে —বুঝতে পারছি। কি করি, ছাড়ল না কিছুতে—সিনেমায় ধরে নিয়ে গেল। মন পড়ে আছে এখানে, ছবি কি দেখেছি ছাই? আর আমি যাবো না। কোন দিনও না।

সে কি? কোন দুঃখে খোঁড়ার সঙ্গে খোঁড়া হতে যাবে জয়ন্তী?

জয়ন্তী সজল চোখে বলে, দুঃখ নয়, আনন্দ। যে আনন্দে গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ হয়ে থাকতেন। কিন্তু আর নয়—চুপ!

মুখে হাত চাপা দিয়ে আটকাল জয়ন্তী। এ সব কথা কক্ষণো আর বলবে না। বললে—

মুখ টিপে হেসে অমরেশ বলে, কি হবে বললে?

কিচ্ছু না—

সহসা বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গভীর আলিঙ্গনে আচ্ছন্ন করল অমরেশকে। কথা শেষ হয়ে যায়। যত বয়স হচ্ছে, জয়ন্তী যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

পরদিন বিকালে বনমালী গাড়ি যথারীতি ফটকে এনে রাখল। অমরেশ বারাণ্ডায় ইজিচেয়ারে বসেছিল মেঘপুঞ্জিত আকাশের দিকে চেয়ে। সাজগোজ করে জয়ন্তী হাসিমুখে এসে দাঁড়াল।

অমরেশ ঘাড় ফিরিয়ে বলল, চললে?

দেখ, তোমায় ওদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় না—

অমরেশ সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়। নিশ্চয়ই নয়। খোঁড়া বর নিয়ে দেখানো গৌরবের নয়—কে না জানে?

জয়ন্তী চটে গিয়ে বলে, বটে! নিশ্চয় নিয়ে যাবো। চলো— উঠতেই হবে! আমার হল ঘর-আলো-করা বর—সকলের কাছে বরের জাঁক করে বেড়াই। নিয়ে যেতে চাইনে কেন জানো? বর যদি ডাকাতি করে কেউ কেড়েকুড়ে নিয়ে নেয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল একটুখানি। বলে, ওঠো। আজকে ওদের সঙ্গে নয়—আমরা দু-জনে একলা বেড়াবো।

অমরেশ ঘাড় নেড়ে বলে, পারছি না জয়ন্তী। বেশ আছি, উঠানামা করতে ইচ্ছে করছে না। কষ্টও হয়।

কিছুতে যাবে না। কি করে জয়ন্তী? নেমে গেল ধীরে ধীরে। রূপের লহর তুলে চলে গেল।

খোঁড়া বলে তোমার করুণা হয়েছিল জয়ন্তী, খোঁড়া করে দিয়ে দায়িত্ব এসে পড়েছিল। দিয়েছ-ও আমায় প্রচুর। তা বলে চিরজন্ম খোঁড়া আগলে বসে থাকবে, এই বা কেমন কথা? পারে নাকি কেউ,

বিরক্তি আসে না? তবু তুমি কত ভালো! তোমার মুখের হাসিতে ছায়া পড়ে না কখনো, কথায় থাকে না এতটুকু তাপ।

কিন্তু স্বামী হয়ে এমন মনোভাব বজায় রাখা যায় না খুব বেশি দিন। মাস খানেক পরে অমরেশই একদিন প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছ?

স্বরের রূঢ়তায় জয়ন্তীর চমক লাগে। ক্ষণকাল অবাক হয়ে থাকে তার দিকে চেয়ে।

কৈফিয়ৎ চাও?

চাইতাম যদি পুরোপুরি স্বামী বলে আমায় ভাবতে। যদি তোমার গলগ্রহ না হতাম।

অর্থাৎ আমিই যদি গলগ্রহ হতাম তোমার। পুরুষের সেই যা চিরকালের মূর্তি। কিন্তু জবরদস্তি অনেক যুগ ধরে চলেছে, এখন আর চলে না।

অসহ্য লাগছে আমাকে?

জয়ন্তী কঠিন স্বরে বলে, এ তোমার অন্যায় আশা। ঘরে বসে তুমি আকাশের তারা গুণবে, আকাশ-পাতাল ভাববে—অন্য সকলে যদি তা না পেরে ওঠে!

সেই বেরুল জয়ন্তী, আর ফেরেই না। বাড়িসুদ্ধ নিষুপ্ত, অমরেশ একলা কেবল জেগে। কান খাড়া আছে—হ্যাঁ, ফিরল এতক্ষণে। মোটর এসে দাঁড়াল, দরোয়ান ফটক খুলে দিল। উঠছে সে উপরে, দরজায় করাঘাত করছে মৃদুভাবে।

অমরেশ সাড়া দেয় না। চুপ করে থাকা যাক তো এমনি। ঘুমিয়ে পড়েছে—তাই যেন শুনতে পাচ্ছে না। জয়ন্তী জোরে ঘা দেয়—জোরে, আরও জোরে। নিতান্তই মৃত্যু না ঘটলে এর পর সাড়া না দেওয়ার মানে হয় না।

দেয়াল ধরে ধরে গিয়ে অমরেশ সুইচ টিপল, নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল। সারা মুখের উপর উজ্জ্বল আলো পড়েছে—নিশিরাত্রে স্বপ্ন-

লোকের পরী এসে ঘরে ঢুকল। এ যেন অপরিচিত আর এক জয়ন্তী। অমরেশের বুকের ভিতর রি-রি করে ওঠে।

দরজা ভাঙছিলে—পাড়াময় ঘুম ভাঙিয়ে জানান দিলে যে ফেরা হল এইবার বাড়ি। এতে কি খুব মুখোজ্জ্বল হল?

জয়ন্তী সহজভাবে বলল, নয় তো তুমি যে কিছুতে সাড়া দাও না। তোমার ঘুম ভাঙাতে গিয়েই পাড়াপড়শির ঘুম ভেঙে গেল। উপায় কি বলো?

আয়না-দেওয়া বড় আলমারির কাছে গিয়ে কানের ঝুমকো খুলছে। অমরেশ বলে উঠল, সাজগোজ বড় বেশি বেশি দেখা যায় আজকাল—

ফুরিয়ে যাচ্ছি কিনা—সাজগোজে আসল চেহারা ঢেকে তাই ভোলাতে হয় তোমাদের।

সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে মোহময় হাসি হেসে বলল, দেখ তো—পছন্দর মতো কিনা আমি এ পোশাকে।

অমরেশ চোখই তুলল না। তিক্ত কণ্ঠে বলে, নিরুপায় গলগ্রহ হয়ে আছি—আমার আবার পছন্দ-অপছন্দ! এ সব তারা ভাবুকগে রাত দুপুর অবধি যাদের পছন্দ কুড়িয়ে এলে।

জয়ন্তীর মুখের উপর দপ করে যেন আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। কিন্তু সে নিমেষের জন্য। ঠিক আগেকার কণ্ঠেই সে জবাব দিল, তা ঠিক। ঘরের মানুষ অহরহ আটপৌরে মূর্তি দেখছে, সে চোখে ফাঁকি চলে না। একটু শুধু যাচাই করে নেবার জন্য কথাটা তোমায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

সজ্জা খুলে খাটের প্রান্তে সে শুয়ে পড়ল। সাড়া নেই অনেকক্ষণ, খুব সম্ভব ঘুমিয়ে পড়েছে। অমরেশের এমন একটা ব্যঙ্গোক্তি জয়ন্তী কানেই নিল না—পিছলে পড়ে গেল বাইরে। আর, দেখ, কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে বিভোর হয়ে। কি যেন হয়েছে অমরেশের—আঘাত না দিতে পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, কি করবে ভেবে পায় না। স্বগত ভাবেই এক সময় বলে ওঠে, রাজশয্যা বিষের মতো লাগছে—

হল না, ভাষার ভুল হয়ে গেল। বলো, কাঁটার মতো—

জেগে আছে তবে জয়ন্তী। অমরেশ উঠে বসল বিছানায়।

আমি থাকতে পারছিনে আর এমন করে—

জয়ন্তী বলে, বাইরে ঠাণ্ডায় বসোগে একটু। মাথা গরম হয়ে গেছে। তা-ই উচিত। ধরব, দিয়ে আসব বাইরে?

ক্রুদ্ধকণ্ঠে অমরেশ বলে, আমি পঙ্গু—কথায় কথায় সেটা মনে করিয়ে না দিলেই নয়? জিজ্ঞাসা করি, কে করেছে আমার এ অবস্থা?

জয়ন্তী সহজভাবে স্বীকার করে নেয়, আমি। কিন্তু তারও চেয়ে বড় দোষ আমার, চার বছর একটা মানুষকে অচল নিষ্কর্মা ভাবে বাড়ির মধ্যে বসিয়ে রাখা। দেহ নড়ে না, মস্তিষ্কই শুধু আজব ভাবনা ভেবে মরে। এ বাড়ি ছেড়ে সত্যিই কিছুদিন তোমার বাইরে থাকা দরকার হয়ে পড়েছে।

যাবো, তাই যাবো। পাগল হয়ে যেতে হবে এ ভাবে আর বেশি দিন থাকলে।

উত্তেজনায় কয়েক পা গিয়ে অমরেশ ক্রাচ টেনে নিল বগলে।

জয়ন্তী বলে, বেশি ঠাণ্ডা লাগিও না। সেবারের মতো যদি কাশি বেধে যায়, আমি জব্দ হবো ঠিক—কিন্তু তোমারও কষ্ট কম হবে না।

তোমায় কিছু করতে হবে না আমার জন্য—

উঁহু, আমি কেন—কত দিকে কত আত্মীয়জন হা-হুতাশ করে বেড়াচ্ছে, আমাদের মা-বাপ আছেন, ছেলে আছে, মেয়ে আছে—তারাই সমস্ত করবে!

জবাব না দিয়ে অমরেশ বারাণ্ডায় চলে গেল। জয়ন্তী অনেক খেটে এসেছে—অনাথ ছেলেমেয়েদের একটা বোর্ডিং হচ্ছে, তারই প্রতিষ্ঠা উৎসব ছিল। বড় ক্লান্ত, পেরে উঠছে না। তবু উঠল সে একবার। উঁকি দিয়ে দেখল, বারাণ্ডার সোফায় বসে নিচু টেবিলের উপর অমরেশ মাথা গুঁজে আছে। ঘুমালো নাকি এই অবস্থায়? টিপিটিপি জয়ন্তী পর্দাটা ফেলে দিয়ে এল, বেশি ঠাণ্ডা না লাগে।

তার পরে জয়ন্তীও ঘুমিয়ে পড়েছে। আর কিছু জানে না। আহা, জানে বই কি! ঘুমের মধ্যেই তো তার ব্যস্ত জীবন—পুরো সংসারের কাজকর্ম। তার খোকা নাচে সামনে এসে—কাজে ভণ্ডুল ঘটিয়ে দেয়। তোড়া পরিয়ে দিয়েছে কে খোকার পায়ে, তোড়া বাজে ঝুনঝুন করে।

আয়, আয় রে খোকনমণি, কোলে আয় দিকি একটু। আসবি নে?

খোকা মিটিমিটি হাসে, দুষ্টুমির চোখে চায়। সেই যে বীভৎস মাংসের দলা...কেমন বেশ বড় হয়ে গেছে, সুন্দর হয়েছে। সাদা-সাদা ছোট্ট যেন ইঁদুরের দাঁত—দাঁতের হাসি ঝিলিক দেয় বিদ্যুতের মতো। জয়ন্তী ছুটে যায় খোকার দিকে—বাহুপাশে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলতে। বুকে তুলে চুমু খাবে। ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল যেন। বুকের মধ্যে বিষম ব্যথা। ব্যথা পেয়ে সে ফোঁপাচ্ছে, কি যেন বলতে যাচ্ছে খোকাকে ডেকে—মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না...

তখন বুঝল ঘুমিয়ে আছে সে—স্বপ্ন দেখছে ঘুমের মধ্যে। এর আগে এমন হয়েছে আরও। নিজের সমগ্র চেতনা প্রাণপণ চেষ্টায় সংহত করে সে জাগল। অভিমান হয়—এতক্ষণ ধরে এমন আওয়াজ করছে, এত কষ্ট পাচ্ছে—অমরেশ জাগিয়ে তুলল না তাকে? পরক্ষণে মনে পড়ল, বাইরে তো অমরেশ। কত রাত হয়েছে—এখনো বাইরে পড়ে? অসুখ করবে যে!

বাইরে গিয়ে দেখল, পশ্চিমে অনেক দূরে সাদা বাড়িটার চিলে-কোঠার আড়ালে চাঁদ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভোর হয়ে এলো। কিন্তু অমরেশ নেই তো বারান্ডায়—কোথায় গেল? যাবে আর কোথায়, যাবার কি শক্তি আছে? আছে কোনখানে, হয় তো বা বৈঠকখানায় গিয়ে শুয়েছে। এখন ডাকাডাকি করে মানুষজন জাগানো ঠিক হবে না। বেশি রাত করে বাড়ি ফিরেছে—দরজা খোলানোর চেষ্টায় অনেকেই তা টের পেয়েছে। স্বামীর রাগ এর উপরে বাইরে আর জানান দেওয়া হবে না।

খোঁড়াচ্ছে একটা ছেলে। অমরেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখে, একজন কেন—পুরো একটা দল। চোখ ফিরিয়ে নেয়, তাকাবে না আর ওদিকে। দেখেছে বুঝতে পারলে হতভাগারা আরও পেয়ে বসবে। চোখ ফেটে জল আসার মতো হল। অবস্থা ভাল ছিল না বটে কিন্তু সবল নিখুঁত দেহ—আশৈশব চেহারার সকলে তারিফ করে এসেছে। আর এখন তার চলন দেখে হাসছে ঐ দেখ। ঘরের মধ্যেই চুপচাপ বসে থাকতে হবে চিরজীবন—তা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কি করে থাকে সে ঘরে, ঘরের কর্ত্রীর যখন ঐ রকম ব্যবহার? হায় ভগবান, ঘর-বা'র কোথাও তার শান্তি নেই?

ছেলেগুলো সমস্বরে এবার ছড়া কাটছে—

খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং

কার দুয়ারে গিয়েছিলি, কে ভেঙেছে ঠ্যাং?

নিতান্ত নাছোড়বান্দা। মুখ ফিরিয়ে আছে তো কানে না ঢুকিয়ে শুনবে না। পালাতে গেলে পিছু নেবে নিশ্চয়—হাততালি দিয়ে পিছু পিছু চলবে। অগত্যা বসে পড়ল সেই পার্কের এক বেঞ্চিতে। ছেলে-গুলো তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

ইতস্তত করে অমরেশ অবশেষে চোখ তুলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ সকলে। কে বলবে, একটু আগে এমন সোরগোল হচ্ছিল!

অমরেশ ডাকে, শোন তোমরা, কাছে এসো, শুনে যাও—

কেউ আসে না। দূর থেকে তাকাচ্ছে, দু' পা এক পা করে পেছোচ্ছেও কেউ কেউ।

অমরেশ হেসে বলে, এমন ভীরু—ছিঃ!

গটমট করে একটা ছেলে এগিয়ে আসে। উদ্ধত ভঙ্গিতে কাছে এসে দাঁড়াল।

তোমার ভয় করে না বুঝি?

না—

তা বেশ...ভালো! নাম কি তোমার?

অ্যাং-ব্যাং—

অ্যাং-ব্যাং আবার নাম হয় বুঝি? থাকো কোথায়?

গড়ের মাঠ—

যা মনে আসছে, বলে যাচ্ছে বেপরোয়া ভাবে। আচ্ছা ছেলে তো! অমরেশ বলে, তোমরা ঐ সব বলছিলে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে?

না তো—

দেখ ,মিথ্যে কথা বলতে নেই—

ছেলেটা আরও একটু কাছে এসে ড্যাবডেবে চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করে, বললে কি হয়?

ঠাকুর রাগ করেন—

কথা বলে না সে ক্ষণকাল। ঠোঁটের উপর দুটো আঙুল চাপিয়ে গম্ভীর হয়ে ভাবছে। ভঙ্গি দেখে অমরেশের মজা লাগে। জোর দিয়ে সে আবার সেই কথাই বলে।

ঠাকুর ভয়ানক রাগ করেন মিথ্যে কথা বললে—কানাকে কানা বললে, খোঁড়াকে ন্যাং-ন্যাং করলে।

সজোরে ঘাড় নেড়ে ছেলে এবার প্রতিবাদ করে, না—কক্ষণো না। মিথ্যে কথা। ঠাকুর থাকেন কত উঁচুতে—ঐ আকাশের উপর। শুনতে পাবেন তিনি কি করে?

সব তিনি শুনতে পান। চোখ মেলে সমস্ত দেখেন। কানা-খোঁড়াদের বড় কষ্ট কিনা—তার উপরে আবার তাদের কষ্ট দিলে ঠাকুর রাগ করেন।

ছেলের ঘোরতর আপত্তি। ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কষ্ট না আরো কিছু! কানা-খোঁড়া হওয়াই তো ভালো। কত মজা! রাস্তায় কাপড় পেতে বসে থাকে—কত জনে পয়সা দিয়ে যায়, খাবার খেতে দেয়—

হঠাৎ—কি আশ্চর্য ব্যাপার! মনোরমা।

এর মধ্যে বেরিয়ে পড়েছ বকুল? খুঁজে খুঁজে হয়রান। মুখ ধোওয়া নেই, খাওয়া নেই, লেখাপড়া নেই—

ছেলেটাকে মনোরমা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। অমরেশকে দেখেনি। ছেলে গ্রেপ্তারের তালে ব্যস্ত ছিল, আর অমরেশও সেই ফাঁকে অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বসল। ঐ তার ছেলে নাকি? ...মনোরমা দেখতে পায়নি ভাগ্যিস! তা হলে ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে টাকার দাবি করত। টাকাটা সে হয়তো জয়ন্তীকে চুরি করে কায়ক্লেশে মিটিয়ে দিতে পারবে—কিন্তু ছেলে...রেবার স্মৃতিকণ্টক ঐ ছেলে নিয়ে কি করবে এখন সে? কোথায় নিয়ে তুলবে? বোঝা গেল, বাইরে বেরুনো তার চলবে না। নিজে তো ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র, তার উপরে এই উপসর্গ। এত কাছাকাছি এসে জুটেছে মনোরমারা—বাড়ি ফেরা যাক তাড়াতাড়ি। পদব্রজে অতঃপর সে আর ফটকের বাইরে আসছে না।

দোকানের জন্য জনার্দন এবারে ভাল ঘর পেয়েছেন চওড়া রাস্তার উপরে। বাড়ি থেকে দূরও নয়। সকালে স্নান-আহ্নিক সেরে দোকানে গিয়ে বসেন। দুপুরবেলা একজন কাউকে বসিয়ে—হয়তো বা বকুলকেই বসিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি খেয়ে যান। দিবা-নিদ্রাটুকু দোকানের মেঝেয় সপ পেতে সেরে নেন—গণেশ ঠাকুরকে সন্ধ্যা দেখিয়ে ধুনো-গঙ্গাজল দিয়ে দোকানঘরে তালা বন্ধ করে বাড়ি চলে আসেন।

বকুলকে মনোরমা টানতে টানতে নিয়ে আসছে। জনার্দন বেরুচ্ছিলেন—মনোরমা বলে, ছোঁড়াগুলো এই সাত সকালে ঘুম থেকে টেনে তুলে নিয়ে বের করেছে। কি বদমায়েস পাড়া তাই দেখ—এ পাড়া না ছাড়লে রক্ষে নেই।

জনার্দন ভ্রূকুটি করে বলেন, পাড়া বদমায়েস নয়, বদমায়েস হল ছেলে। গাছকোমর বেঁধে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সঙ্গে তো ঝগড়া করে বেড়াস, কিন্তু ঐ ছেলে হতে তুই যে সব খোয়ালি—ঠাণ্ডা মাথায় সেটা ভেবে দেখেছিস কখনো?

জনার্দন চলে গেলেন। বাপের কথাগুলো মনোরমার মাথায় ঘুরছে।

শুনলি তো—তোর জন্য আমার ইহকাল নেই, পরকালও নেই। কোন জায়গায় যেতে পারিনে, কোন কাজ করতে পারিনে—চোখের আড়াল হলেই তুই এক অঘটন ঘটিয়ে বসবি। পরের ছেলে কেন এমন করে হাড় জ্বালাচ্ছিস? যা চলে—আমি আর তোর দায় ঠেকতে পারব না।

বকুল গ্রাহ্য করে না। গালি দিচ্ছে—সে তো দেবেই যখন সে বজ্জাতি করে বেড়ায়। বড় বড় চোখের দৃষ্টি মেলে মনোরমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবো?

শোন আবদার! ঠিকানা বলে দেব, তবে উনি যাবেন। যাবার জায়গা থাকলে আমিই কি থাকতাম রে! হোক না বাবা—কথায় কথায় এত খোঁটা আমার ভাল লাগে না।

মনোরমা আঁচলে চোখ মুছল। বকুল পরমাগ্রহে বলছে, তাই চল্। বুড়ো দাদু ভাল না। তুই আর আমি দু'জনে থাকব—খাসা হবে—বড্ড মজা হবে।

সব দুঃখ ভুলে যেতে হয় বকুলের কথা শুনে।

আমি কেন, তুই একলা চলে যাবি—একা-একা থাকবি।

মুখ-চোখ ঘুরিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে বকুল বলে, ওঃ—

তা না হয় গেলাম, কিন্তু খাবো কি বলতে পারিস?

পরম নিশ্চিন্ততায় বকুল বলে, ভাত—

কোথায় পাবি?

রেঁধে দিবি তুই—

কিন্তু টাকা? চাল কিনতে হবে তো টাকা দিয়ে? টাকা আনতে পারবি খোকা?

আনবো—অনেক টাকা এনে দেবো তোকে? এক বাক্স, পাঁচ বাক্স—

আর এনেছিস্ তুই! কি করে আনবি? লেখাপড়া তো তোর

কাছে বাঘ! খালি দুষ্টুমি করে বেড়াবি। বিদ্যে না থাকলে কি টাকা রোজগার হয়, বড় হওয়া যায়?

অতএব লেখাপড়া করতেই হবে। লেখাপড়া জানলে টাকা আসে, গাড়ি-ঘোড়া চড়া যায়,—সকলের মুখে এই কথা।

মনোরমা বলে, মুড়ি খেয়ে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এবারে পড়তে বোসো—কেমন?

বকুল বই-দপ্তর খুলে বসেছে। পরিণামে সুখ-ভোগের জন্য এই কষ্ট আপাতত করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আলস্য লাগে, উৎসাহে ভাঁটা পড়ে আসে। অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার যে এই লেখা-পড়া—বহু দিন ধরে বিস্তর চেষ্টা করতে হয়। বুড়ো দাদুর দোকানে সে বসে মাঝে মাঝে—ছবি নিয়ে লোকে টাকা-পয়সা দিয়ে যায়। সে বেশ ভালো—পড়তে হয় না, কিছু না—লোকে এসে অথচ পয়সা দিয়ে যায়। সে-ও পারে দোকান চালাতে। জনার্দন যখন বাড়িতে খেতে আসেন, গম্ভীর হয়ে বসে সে তাঁর জায়গাটিতে। খরিদ্দার এলে এ-ছবি ও-ছবি দেখায়, দাম বলে আট আনা, বারো আনা, পাঁচ সিকে—যেটা যেমন মুখে আসে। হাসে খরিদ্দার।...লেখাপড়া না করে বকুল দোকান করবে। দোকানই ভাল সকলের চেয়ে।

চশমা ফেলে গেছেন জনার্দন আজ ভুল করে—চশমা পরে বকুল জনার্দন হল। ডাঁটি-ভাঙা চশমা—কানের সঙ্গে সুতো বেঁধে কসরৎ করে পরতে হয়। জনার্দনের মতোই চশমার ফাঁক দিয়ে কুঞ্চিত দৃষ্টি মেলে চারিদিকে একবার সে তাকিয়ে নিল। পড়তে হবে তো সামান্য এই 'অ-আ'-র বই কেন—জনার্দনের ভাগবত পুঁথিখানা পেড়ে নিয়ে বসল। পুঁথি পড়ছে যখন, চন্দনের ফোঁটা পরা তো উচিত। চন্দন ঘষার অত হাঙ্গামায় গেল না—পারেও না সে—মাটি গুলে বকুল কপালে ফোঁটা দিল তিলক-চন্দনের মতো। ডাবা হুঁকোটা টেনে নিল হুঁকোদান থেকে। কি ভাবে টানলে ফড়ফড় আওয়াজ হয় ভেবে পাচ্ছে না, নানান

কায়দা করছে। জোরে ফুঁ দিতে নলচে দিয়ে জলের ধারা উঠে গায়ে পড়ল। পুঁথিও ভিজে গেছে হুঁকোর জলে। অনেক চেষ্টায় অবশেষে হুঁকো টানা আয়ত্ত করল। বাঃ—দিব্যি আওয়াজ হচ্ছে তো! জলচৌকির উপর বসে হুঁকো টানতে টানতে সে পুঁথি উলটাচ্ছে।

আর দোকানে গিয়ে অনতি পরেই জনার্দনের চশমার গরজ পড়ল। ছবি বাঁধাতে দিয়ে একজনে আর নিতে আসে না—তার নাম-ঠিকানা পড়ে ছবি পেঁৗছে দিয়ে দাম আদায় করে আনতে হবে। দিনকাল বড় খারাপ—ঘরের মধ্যে গদিয়ান হয়ে ব্যবসা চালাবার অবস্থা নেই।

এ কি রে? এই দশা করেছ পুঁথি-পত্তোরের? খেলা এই সমস্ত নিয়ে? আবার তামাক খাওয়া হচ্ছে—বড্ড পাকা হয়ে গিয়েছ!

সজোরে জনার্দন এক চড় মারলেন। ফর্শা গাল রক্তাভ হল। কেঁদে উঠল বকুল।

মনোরমা ছুটে আসে। কি হয়েছে?

বকুল অশ্রুভরা চোখে একবার জনার্দনের দিকে তাকাল। বাপে মেয়ের খণ্ড-প্রলয় বাধে বুঝি! তা ছাড়া অন্যের হাতে মার খেয়েছে, এ ব্যাপারে বকুলের অপমানও আছে। সামলে নিয়ে জবাব দেয়, পড়ে গিয়েছি—

মনোরমা জনার্দনকে প্রশ্ন করে, মেরেছ একে বাবা?

জবাব দেবার আগেই বকুল ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বললাম না যে আমি পড়ে গিয়েছিলাম? কেন তুমি বকবে আমার দাদুকে? না—কিচ্ছু বলতে পারবে না। এসো তুমি, চলে এসো—

মনোরমার সে হাত ধরে টানে। মনোরমা বলে, এইটুকু ছোট্ট ছেলে—ত্রিভুবনে মুখের দিকে তাকাবার কেউ নেই—এর গায়ে হাত তোল বাবা! আবার তুমি ঠাকুর-পুজো করো, ধর্মের বড়াই করো! ভগবান তো এরাই—

ফের? বকুল তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিল মনোরমার মুখে। তুমি আমার কথা কানে নিচ্ছ না মা! আমি বুঝি মিথ্যে বলছি?

রাগ ভুলে মনোরমা হেসে ফেলল।

তাই হবে। ভাল ছেলেরা মিথ্যে বলে না। তারা ভগবান। আমার ভুল—পড়েই গিয়েছিলে তুমি।

জনার্দন গম্ভীর ভাবে কোঁচার কাপড় দিয়ে পুঁথির উপরের জল মুছে ফেললেন। পাতা উল্টাচ্ছেন, ভিতরে কোথায় কি হয়েছে দেখছেন। কিন্তু চোখে জল আসে, চোখের জলে আচ্ছন্ন হয়ে যায় দৃষ্টি। হঠাৎ রুখে উঠলেন, না—মিথ্যে বলবে কেন? ছেলে তোর পরম সত্যবাদী—আমিই খারাপ! মারি নি আমি? পাঁচটা আঙুলের দাগ রয়েছে, গুণে গুণে নে গালের উপর। আবার বলছে, পড়ে গেছে। মিথ্যে কথা বলে দোষ ঢাকছে আমার।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কেউ হাত তোলে কচি ছেলের উপর? আমার মাথার ঠিক ছিল? মাথা ঠিক থাকে কি করে? কাল আর আজ দুটো দিনের মধ্যে একটা পয়সার মুখ দেখলাম না, একটা খদ্দের ঢোকে না দোকানে। মানুষজনের যেন কি হয়েছে—বুড়ো বয়সে এখন কি করে পেট চালাবো, ভেবে পাইনে। ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

দোকানে একাকী বসে জনার্দন তাই ভাবেন। কি হল মানুজনের! ছোটে সবাই চাল-কাপড়ের দোকানে—খাওয়া-পরা ছাড়া কোন-কিছু নিয়ে মাথাব্যথা নেই। সেকালের সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে, জিনিষপত্র সস্তা ছিল আর অগুন্তি খদ্দের। কত রকমের খাসা খাসা ছবি—আজকাল সে সবের চল নেই—কালীঘাটের পট, মা-দুর্গা কৃষ্ণ-রাধা শকুন্তলা-দুষ্মন্ত কালী-তারা-ষোড়শী-ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী-ধূমাবতী-বগলা-দশমা-মাতঙ্গী-কমলা দশমহাবিদ্যার ছবি—কাচ কেটে সাদামাঠা ফ্রেমে কোন গতিকে ঢুকিয়ে দিলেই হল, লোকে মাথায় করে নিয়ে পরমানন্দে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখত। এখন আর এক যুগ। ঠাকুর-

দেবতা নয়—মানুষের ছবি। কত ঢঙে মানুষ ছবি তোলে—বড়লোকেরা তাই বাঁধিয়ে নেয়। ফ্রেমেরই বা কি বাহার! এক রকম ফ্রেম তিনি নতুন দেখে এলেন—কাচের মতো, কিন্তু কাচ নয়। তার উপর কাজ-কর্মই বা কত! ও সব জনার্দনের দোকানে নেই—টাকা কোথায় কিনে রাখবার? ছবি বাঁধানোর বড়লোক খদ্দের তার দোকানে আসে না সে জন্যে।

দোকানপাট বন্ধ করে জনার্দনের বাসায় ফিরতে প্রহর খানেক রাত্রি হয়ে যায়। তখন আর একবার স্নান করেন। আর কোন কাজ নেই তারপর। স্নানের সময় সারাদিনের কাপড়খানা কেচে দিয়ে লাল-পাড় খাটো মাপের তসরের ধুতি পরেন। তেমনি যেন সাংসারিক যাবতীয় চিন্তাও ধুয়েমুছে ফেলেন মন থেকে। কুলুঙ্গি থেকে বংশীবদনকে নামিয়ে ছোট্ট জলচৌকির উপর স্থাপন করেন। মনোরমা যৎসামান্য মিষ্টি ও দু-চার টুকরো ফল কেটে ভোগ সাজিয়ে দিয়ে যায়। ধুনুচিতে নারিকেল-খোসা জেলে ধুনো ছড়িয়ে দেয় তার উপর। ছোট্ট ঘরখানা সুগন্ধ ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পূজার জোগাড় করে দিয়ে মনোরমা রান্নায় বসে। বকুল ঘুমুচ্ছে—আর কোন ঝামেলা নেই। ছেলে সারাদিন দৌরাত্ম্য করে বেড়ায়—সন্ধ্যা হলেই নেতিয়ে পড়ে, তখন তার চোখ মেলবার উপায় থাকে না। জনার্দন সমাহিত হয়ে বসে থাকেন—কখনো ঠোঁট নেড়ে অস্ফুট মন্ত্র পড়ছেন, কখনো বা একবারে স্থির নিস্পন্দ—নিশ্বাস পড়ছে কি না, তা-ও বোঝা যায় না।

পূজা অন্তে একদিন জনার্দন লক্ষ্য করলেন, সন্দেশটা নেই। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! কিছু বললেন না মনোরমাকে, চিন্তান্বিত হলেন। পরদিন দোকান বন্ধ করে আসবার সময় আবার সন্দেশ কিনে নিয়ে এলেন—সন্দেশ-ভোগ আজকেও। সেই সন্দেশও অন্তর্হিত থালা থেকে।

জনার্দন বলেন না, কিন্তু মনোরমার নজর পড়েছে বকুলের প্রসাদ রাখতে গিয়ে।

বাবা, সন্দেশ দেওয়া হল—সে কোথায়?

যাকে দিয়েছিলি, সে-ই খেয়ে গেছে। আমি তার কি জানি?

বলো না কি হয়েছে? বেড়ালে খেলে?

জনার্দন বিরক্ত হয়ে বলেন, তুই ভোগ সাজাস পুজোর পরে গুণে-গেঁথে সমস্ত ঠিকঠাক পাওয়া যাবে—সেই ভরসায় বুঝি!

খাঁটি খবর পাওয়া গেল না বাপের কাছে। চোখ বুঁজে থাকেন, জানবেনই বা কি? বিড়ালের কাণ্ড—মনোরমা একেবারে নিঃসন্দেহ। একটা বিড়াল এসে জুটেছে—খাবার জিনিসপত্র একটু বেসামাল রাখলে রক্ষে নেই। নিজেরা কি খায় ঠিক নেই, তার উপর যত বাইরের পোষ্য এসে জোটে। দেখ না এই বকুলের ব্যাপার—উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এখন তারা বাপে-মেয়েয় যদি বা উপবাসী থাকে, বকুলের ভাত যথাসময়ে জুগিয়ে যেতে হবেই। বংশীবদন—এমন কি নতুন-আসা বিড়ালটার ব্যাপারেও তাই।

মনোরমা বলে, একটু নজর রেখো বাবা পুজোর সময়টা। ঠিক ধরতে পারবে। ঠাকুরের ভোগ জীবজন্তু এসে খেয়ে যায়, সে তো ঠিক নয়।

জনার্দন নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলেন, তুই তো দোর ভেজিয়ে দিয়ে যাস। পুজোর পরে দেখতে পাই, ঠিক তেমনি ভেজানো আছে। বেরাল চলে যাবার সময় বুঝি দোর ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়?

তবে খেয়ে যাচ্ছে কে বলো?

বোঝ্ তাই। তোরা নাস্তিক মানুষ—কিছু বিশ্বাস করিসনে—তাই দেখিয়ে দিলেন চোখের উপর।

কিন্তু জনার্দনের প্রত্যয় কোথায় পাবে মনোরমা? ছোট্ট ঘর—জনার্দনের তক্তাপোশ অর্ধেকটা জুড়ে, বাকি মেঝেয় পুজোপচার

সাজানো। পা ফেলার আর জায়গা নেই। পরের দিন মনোরমা দরজার সামনে লাঠি হাতে পাহারায় বসে রইল।

দেখ বাবা, আজকে গোণাগুণতি ভজে যাচ্ছে কি রকম!

জনার্দন আগুন হলেন।

কেন তুই দরোয়ানি করতে গেলি, কে বলেছে তোকে? পুজোর কোন ব্যাপারে তুই থাকবিনে, মানা করে দিচ্ছি। সব ব্যবস্থা আমিই করব এবার থেকে।

সারারাত জনার্দন অশান্তিতে ছটফট করলেন—ঘুম হল না। পুজোর নামে অপমান করেছেন বংশীবদনকে। দিন দুয়েক কেটে গেল—ভাল করে তবু কথাবার্তা বলেন না কারো সঙ্গে, কাজে কর্মে মন দিতে পারেন না।

দু-দিন পরে পূজা অন্তে অতিরিক্ত খুশি হয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। আজকে এক অপরূপ ব্যাপার—ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চ লাগছে। এত ভাগ্য এই অধম অকৃতী জনের! এমন অহৈতুকী করুণাপর তুমি ঠাকুর! ধূপ ও পুষ্পগন্ধে বাসিত প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে আধ-নিমীলিত ধ্যান-দৃষ্টির সামনে দেখতে পেয়েছি, কেমন ধীরে ধীরে বংশীধারী হাতখানা ভোগের রেকাবিতে নামিয়ে এনে বিদুরের ক্ষুদ তুলে নিলে...

মনোরমাও অবাক। জনার্দন কিছু বলেন নি—কিন্তু তাঁর ভাবে ভঙ্গিতে আন্দাজ পেয়েছে। ছাঁচ-বাতাসা দিয়েছিল আজ—সত্যিই ছাঁচগুলো কে নিয়ে নিয়েছে। জনার্দন মেয়ের উপর আর রাগ করেন না, টিপি-টিপি হাসেন তার বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব দেখে। হাবা মেয়ে নোস তুই—নিশ্চয় কড়া নজর রেখেছিলি, কিন্তু পারলি ধরতে? স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে কারো সাধ্য নেই ঐ চোর-চূড়ামণিকে ধরতে পারে। মা যশোদাকে কম নাকালটা করেছিল! চিরকাল সে ত্রিভুবন ব্যেপে এমনি-ধারা লুকোচুরি খেলে বেড়ায়।

আচ্ছা, বেড়ালে কি ছাঁচ-বাতাসা খায়? অতগুলো ছাঁচ চিবিয়ে খেল, আওয়াজ পাওয়া গেল না তো! মনোরমার মনেও নানা প্রশ্ন

জাগছে। জনার্দন যা বলছেন, তাই কি ঠিক? আমাদের জ্ঞান—জানার বাইরে বিশ্বজগতে অহরহ কত কি বিচিত্র ঘটনা ঘটছে! এই তো, এতখানি বয়স হয়ে গেল—ভাল কথা শোনবার কি উঁচু ভাবনা ভাববার সময় হল কোন দিন? সংসারের দুঃখধান্দার মধ্যে খেটে খেটে জীবনটা গেল।

লোভ বাপের মতো একবার ধ্যানে বসে দেখবে, কি মজা আছে ওর ভিতর! ক্ষণভঙ্গুর জীবনের কি সে সবল সান্ত্বনা! কিন্তু বসবে কোথায়, লজ্জা করে যে! সুবিধা এই, তারা দু'টি মাত্র প্রাণী—সে আর জনার্দন। বকুল তো বিভোর হয়ে ঘুমোয়। জনার্দন ঘরের মধ্যে জপে মজে থাকেন। কে দেখছে তার ধ্যান-মূর্তি? কেউ জানতে পারবে না।

তাই হল। পরের দিন জনার্দন যথারীতি দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন। বাইরে মনোরমা—স্বর্গ-সীমানার বাইরে অভিশপ্ত প্রেতমূর্তির মতো। ঘরে হয়তো শিলা-বিগ্রহ জীবন্ময় হয়েছেন এতক্ষণে...

ঠন করে কি বস্তু পড়ল ওধারে নর্দামার দিকটায়। খুব সম্ভব উপর থেকে কিছু পাচার করছে ওদের চোরা রাঁধুনিটা। মাগীটা যা শয়তান—তার অসাধ্য কোন কাজ নেই।

তুমি? আরে সর্বনাশ—এই কর্ম তোমার? ঠাকুরের ভোগ চুরি করছ দিনকে দিন? আমরা জানি, তুমি ঘুমোচ্ছ—টিপিটিপি বেরিয়ে এসে সেই সময় এই সর্বনেশে দুষ্টুমি—

পুরানো বাড়ির ওদিককার জানলাটা নড়বড়ে। একটা শিক খুলে ফেলা যায়, তা-ও বকুল ঠাহর করে দেখেছে। ঐ শিক আলগোছে খুলে হামাগুড়ি দিয়ে তক্তাপোশের নিচে ঢুকে পড়ে—তার পর ফাঁক বুঝে এক সময় হাত বাড়িয়ে দেয় মিষ্টান্নের দিকে। বেরোবার পর যেমনকার শিক তেমনি বসিয়ে দেয় আবার। দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে ভোগ গ্রহণ করে। আজকেই গোলমাল ঘটল—শিক বসাতে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে গেছে মেঝের উপর।

এত কাণ্ড—জনার্দন তবু চোখ মেলেন নি। যেমন ছিলেন, তেমনি ধ্যানস্থ বসে রইলেন।

ও বাবা, গালমন্দ করো তো আমাকে! এবারে দেখে নাও, কোন ঠাকুর নিত্যি এসে ভোগ খেয়ে যায়। চোর—চোরের রাজা। এইটুকু বয়সে এমনি, চোর-চক্রবর্তী হবে কালে কালে—ফাটকে পচে মরবে।

চোখ মেললেন জনার্দন। প্রদীপ নিবু-নিবু হয়েছিল—মনোরমা উসকে দিল। প্রদীপের আলোয় আর প্রসন্ন হাসিতে জনার্দনের মুখ ভারি উজ্জ্বল। এতটুকু রাগ-দুঃখ নেই। দু-চোখ ভরে নতুন দেখছেন আজ বকুলকে—আবিষ্ট দৃষ্টি মেলে দেখছেন।

বকুলের হাতের মুঠো মনোরমা জোর করে খুলে দেখাল।

দেখ বাবা, দু-হাত ভরতি খেজুর আর নারকেল-নাড়ু—

জনার্দন হাঁ-হাঁ করে ওঠেন।

কেড়ে নিস নে রে, খবরদার! কিচ্ছু বলবি নে ওকে—

ঠাকুরের ভোগ এঁটো করে খেয়েছে, বাসি কাপড়ে বিগ্রহও ছুঁয়ে ফেলেছে হয় তো। জনার্দন তবু এই বলছেন! বুঝতে না পেরে মনোরমা হাঁ করে বাপের দিকে চেয়ে থাকে।

জনার্দন বলেন, ও জানে, সমস্ত প্রসাদ ওরই জন্য তোলা থাকবে। তবু ঘুম ভেঙে যায় কেন? কিসের টানে ঐটুকু ছেলে চোখ মুছতে মুছতে এসে ভোগ চুরি করে? আমার বংশীবদন এমনি ভাবে ছলনা করে বেড়ান নানা মূর্তিতে। নিরন্ন নির্ধনের ঘরে দয়াল এসে উঠেছেন।

এ যে উল্টো-উৎপত্তি হল! জনার্দন খিটখিট করতেন আর মনোরমাই সামলে নিয়ে বেড়াত বকুলকে। সেই বুড়ো এখন অগ্নিশর্মা হয় মনোরমার উপর যদি সে তিলেক মাত্র ছেলে শাসন করতে যায়। আর বকুলও পেয়ে বসেছে। মনোরমার কাছে তেমন জুত হয় না—কিন্তু ঠাকুর হবার যাবতীয় সুখ ও আরাম বুড়ো ভক্তটির কাছ থেকে পুরোমাত্রায় সে আদায় করে নিচ্ছে। দেবতা-বকুলের হাঁক-ডাকে তটস্থ তিনি।

সংসার মাত্র আড়াই জনের—তা-ও আর চালানো যাচ্ছে না। দোকান থেকে ফিরে জনার্দন সেদিন মুখ শুকনো করে বসে আছেন, নড়ে বসবারও শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

বকুলের আর ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকবার হেতু নেই, দাদুর অপেক্ষায় বসে থাকে। দু-হাতে জনার্দনের কণ্ঠ বেষ্টন করে সে বলল, চান-টান কখন করবে দাদু? পুজোয় বসবে না?

বসবো তো রে—আজ কিন্তু ঠাকুরের নিরম্বু উপোস। ভোগ কিনবার পয়সা জুটল না—ধানদূর্বা আর বেলপাতা। হায় ভগবান, বুড়ো বয়সে কত যে দুঃখ আছে অদৃষ্টে!

বকুলও অবিকল সেই সুরে বলে ওঠে, হায় ভগবান!

হেসে ওঠেন জনার্দন। না হেসে কেউ থাকতে পারে অমন ভাব-ভঙ্গি দেখে? গুমোট কেটে গেল।

হাসতে হাসতে জনার্দন বলেন, রোসো—আসছে সেদিন। হাসি শুকিয়ে যাবে মুখ থেকে। তার দেরি নেই।

মনোরমা এসে বকুনি দেয়, বাচ্ছা ছেলের সঙ্গে কি রকম কথাবার্তা বাবা? মুখ চুণ হয়ে গেছে।

জনার্দন বললেন, আর পেরে উঠব না—সে আমি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিচ্ছি। ও-ই আমার দাদু হয়ে সংসার দেখাশুনা করুক।

গভীর নিশ্বাস ফেললেন। মনোরমার পিঠোপিঠি এক ছেলে হয়েছিল। বাঁচল না। জামাইটাও যদি থাকত, বুড়ো বয়সের তবু এক আশ্রয় হত—একটুখানি ভরসার আলো দেখতে পেতেন তিনি।

পয়সা চাই। বুড়ো দাদু চোখের জল ফেলেছে পয়সা নেই বলে। বাড়ির অনতিদূরে শিববাড়ি—বকুল ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে সেখানে। উল্টাদিকের ফুটপাতে কয়েকটা ভিখারি।

অন্ধ নাচার বাবা, একটি পয়সা দাও—

চেঁচাচ্ছে এমনি। চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। স্থূলবপু এক মহিলা একটা আনি ফেলে দিয়ে মন্দিরের চাতালে উঠলেন। আহ্নিক করলেন অনেকক্ষণ ধরে, আরও বহু জনে করছে। তার পর নেমে আবার রাস্তায় এসেছেন—

অন্ধ নাচার মা—

এ কোন কচি অন্ধ রে! মহিলা তাকালেন তার দিকে। তাকিয়েই টের পেলেন।

জোচ্চুরির জায়গা পাস না? ওইটুকু ছেলে, মুখ টিপলে দুধ বেরোয়...ও মা, কালে কালে হয়ে উঠল কি!

অন্ধ নাচার—

দাঁড়া, তোর বজ্জাতি বের করছি। পুলিশ ডাকব।

পুলিশের নামে বকুল ভয় পেয়ে গেল। বিশুষ্ক মুখে বলে, সত্যি অন্ধ—মাইরি...বিদ্যের কিরে—

একটু ভিড় জমেছে। নানা জনের নানা মন্তব্য। এরই মধ্যে জয়ন্তীর ঝকঝকে মোটর এসে থামল। এই দিক দিয়ে যাচ্ছিল। তাকিয়ে দেখে নেমে পড়েছে।

কি হয়েছে?

দেখুন দেখুন—বাচ্চা ছেলে অন্ধ সেজেছে। পয়সা জুটিয়ে বিড়ি-টিঁড়ি খাবে আর কি!

জয়ন্তী বলে, বিড়ি হতে পারে, ছাতু-মুড়িও হতে পারে। যা দিন-কাল পড়েছে, কিচ্ছু বলা যায় না। হ্যাঁরে, বিড়ি খাবি তুই বুঝি?

আমি বিড়ি খাইনে। বিদ্যের কিরে।

কি খাস?

বাতাসা খাই, ভোগ খাই, ভাত আর আলু-ভাতে খাই—

জয়ন্তী মহিলার দিকে হাসিমুখে বলে, কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে কি রকম দেখুন। বড় হলে যা হবে—

মহিলা তিক্ত কণ্ঠে বলেন, এখনই বা কম কিসে? লোক ঠকাচ্ছে। অন্ধ ওর কোন পুরুষে নয়।

বকুল বলে, সত্যি আমি অন্ধ। চোখ বন্ধ আছে, এই দেখ—

জয়ন্তী বলে, হাতে আমার কি আছে, বল্। অন্ধ হলে ঠিক বলতে পারবি।

ব্যাগ—

উঁহু—হল না। উনি ঠিক বলেছেন, অন্ধ তুই কখনো নোস। হাতে যে আমার ছাতা।

বকুল রাগ করে বলে, কক্ষণো না। হাতে ব্যাগ আছে তোমার—

আচ্ছা, কেমন ব্যাগ? রাঙা, সাদা না কালো?

সাদা—

জয়ন্তী হেসে উঠে বলে, সত্যি অন্ধ তুই। আর সন্দেহ করা চলে না। বাড়ি কোথায় রে তোর?

হুই, উদিক পানে—

কে কে আছে?

মা আছে, দুধগোপাল আছে, দাদু আছে—

দুধগোপালটা কে?

বেড়াল। খেলা করে আমার সঙ্গে, শোয়—

জয়ন্তী একটা টাকা দিল। আহ্লাদে তিড়িং করে এক নাচন দিয়ে গলিঘুঁজি ভেঙে বকুল চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়ন্তী যেন সম্বিৎ হারিয়ে তাকিয়ে আছে।

স্থূলাঙ্গিনীর কথায় চমক ভাঙল।

কেমন অন্ধ, দেখলেন তো? এদের আগাপাস্তলা চাবকানো উচিত।

টাকা এলো কোত্থেকে জনার্দনের ফতুয়ার পকেটে? রুপোর টাকা,

নোট নয়। পড়ে ছিল আগে থেকে, তিনি টের পাননি—এমনটা হতে পারে না।

মনোরমা বলে, খদ্দের কেউ দিয়ে গেছে বাবা। ঠাকুরের কথা ভাবছিলে হয়তো তখন—অন্যমনস্ক হয়ে পকেটে ফেলেছ।

তাই হবে—

জনার্দন হাসলেন। কথা বাড়িয়ে লাভ কি, মনোরমা বুঝবে না। তাই বটে! খদ্দের আজকাল এত টাকাকড়ি দিয়ে যায় যে অন্যমনস্ক হয়ে কোথায় কি রাখেন, খেয়াল থাকে না। কালকে উপোস গেছে—খুব জব্দ হয়েছ ঠাকুর—দায়ে পড়ে ভোগের টাকা নিজে দিয়ে গেছ পকেটের ভিতর।

অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। তাঁর উপর যাদের নির্ভর, তারা কষ্ট পাচ্ছে। নিজের বা মেয়ের জন্য তত ভাবেন না—অবোধ অবোলাগুলোর জন্য—ঐ বকুল, বংশীবদন, দুধগোপাল। এটা বোঝা যাচ্ছে, ঘরে বসে এই ভাবে দোকান চলবে না। রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে খদ্দের ধরতে হবে। কার বয়ে গেছে—কে তোমার দোকান অবধি এসে ছবি কিনবে, ছবি বাঁধাতে দিতে যাবে? ঐ তো সব মান্ধাতার কালের ছবি, আর কাঠে কাঠে পেরেক ঠুকে বাঁধানো!

ভেবে চিন্তে জনার্দন একটা থলিতে কিছু ছবি আর বাঁধানোর যন্ত্রপাতি ভরলেন। ফ্রেমের তাড়া আর কাচ ন্যাকড়ায় জড়িয়ে বগলদাবায় যাবে। রাস্তায় হাঁক দিয়ে বেড়াবেন, ছবি বাঁধাই—ছবি-ই-ই—

ডাকবে নিশ্চয় কেউ কেউ। ছবি সেখানে বসে বাঁধানো না-ই যদি হয়ে ওঠে, অর্ডার নিয়ে আসা যাবে। ভাবতে ভাবতে জনার্দন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কত বাড়িতে দেখা যায়, পুরানো ছবি ভেঙে পড়ে আছে—কর্তাদের উদ্যোগ হয় না নতুন করে বাঁধাবার। বাড়ির উপর গেলে চাড় হবে।

কিন্তু প্রথম দিন পুরো একটা বেলা ঘোরাঘুরিই সার হল। ফিরে

এসে গড়িয়ে পড়লেন—রোদে ও ক্লান্তিতে অবসন্ন। এ বয়সে পোষায় কি এমন করে? হায় ভগবান, কত দুঃখ আছে এই পোড়া অদৃষ্টে! দুঃখ না থাকলে ছেলেটা চলে যাবে কেন—থাকলে আজকে কি নড়ে বসতে হয়?

মনোরমা বলে, হল কিছু?

আট আনার পয়সা বের করে তার হাতে দিলেন। বললেন, আর খানিকটা ঘুরলে হত। কিন্তু রোদে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, চোখে অন্ধকার দেখলাম। ক্ষমতার শেষ হয়েছে বুঝতে পারছি, এখন চলে যাওয়ার পালা।

বকুল এসে বড় বড় চোখ মেলে শুনছিল। তার পর সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জনার্দন বললেন, মনে কষ্ট হয়েছে ওর। না, ওর সামনে আর কিছু বলা হবে না। মুখ আঁধার হয়ে গেল—দেখেছিস নজর করে?

ডাক্‌ছেন, বকু—বকুল বাবু! কোথায় গেলে মাণিক আমার?

বারান্ডার নিচে উঠানের প্রান্তে দেখতে পেলেন, এদিকটায় পিছন ফিরে অতি নিবিষ্ট হয়ে বকুল কি করছে। টিপিটিপি গিয়ে আড়কোলা করে তুলে ধরলেন।

ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না—করছ কি এখানে বসে?

সে-ও কোথা থেকে এক থলি জুটিয়েছে। ফ্রেম আর কাচের ছাট পুরেছে তার ভিতর। মতলব বোঝা গেল অতএব।

জনার্দন বলেন, ছিঃ—ফেরিওয়ালার কাজ তোমায় কি মানায় সোনার ঠাকুর? তুমি পাটে বসে থাকবে। পড়বে, লিখবে, হাসবে, খেলবে। না, না—আমরা যা করি, তুমি সে সব করতে যাবে কেন?

পরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেন। ভেবে চিন্তে এই ঠিক হয়েছে—বেলা বাড়বার আগেই বাড়ি ফিরবেন, তারপর খাওয়া-দাওয়া অন্তে দোকানের দরজা খোলা হবে। দোকান একেবারে ছাড়া চলবে না, দুই কূল রাখতে হবে। মারা পড়তে পারেন না তো ঠিক-দুপুরে পথে পথে ঘুরে রোদে সিদ্ধ হয়ে? মরার ভয় এমনি অবশ্য নেই, কিন্তু মরলে যে

একটি পয়সাও এনে দেওয়া যাবে না—ওদের সংসার চলবে কেমন করে?

রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে, জল জমে আছে রাস্তায়। সন্তর্পণে এগুতে হচ্ছে। শিববাড়ি ছাড়িয়ে ট্রামরাস্তায় পা দিয়েছেন, মিষ্টি রিনরিনে গলা কানে এল, ছবি—ছবি—ছবি-ই-ই—

এক বাড়ির পাঁচিলের গায়ে জনার্দন গুটিসুটি হয়ে দাঁড়ালেন। কাছে যেই এসেছে—বলে উঠলেন, কই গো, কোথায় ছবি? আমি চাই। এই যে—সোনার ছবি এই আমার বুকে তুলে নিয়েছি। আরে, আরে —এ কি মূর্তি হয়েছে, পড়ে গিয়েছিলে দাদাভাই?

বন্দী বকুল পা দাপাচ্ছে, দু-হাতে গুমগুম করে মারছে জনার্দনের পিঠে। তাই কি পারে বুড়োর সঙ্গে? কোলের উপর নিয়ে একেবারে মনোরমার সামনে তাকে হাজির করলেন।

পা পিছলে আছাড় খেয়েছে। গা ধুইয়ে কাপড় বদলে দে। আমাদের দুঃখ দেখে রোজগারে বেরিয়েছিল—কিছু বলিসনে মনু, খবরদার!

খুব রেগে আছে বকুল। সমস্তটা দিন একটা কথা বলে নি জনার্দনের সঙ্গে। একবার হাত ধরে ফেলেছিলেন, এঁকে-বেঁকে ছাড়িয়ে নিল। চোখে জল টলটল করছে, জোর করে ধরতেও ভরসা হয় না। পুজার প্রসাদ দেবার সময় দেখা গেল, অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে বিছানায় পড়ে। ঠেলাঠেলি করেও ঘুম ভাঙল না। মুখের মধ্যে জনার্দন একটা কদমা ভেঙে একটুখানি দিতে গেলেন। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে আছে ঘুমন্ত মানুষ। সাধ্য কি মিষ্টি খাওয়ানো যায়!

পরদিন ঘুম ভেঙে উঠে আসবার সময় মনোরমা শিকল দিয়ে বকুলকে ঘরে আটকে এল। জনার্দন বেরিয়ে পড়ুন, বেলা হোক—তখন দরজা খুলবে। হল তাই। অনেকক্ষণ জনার্দন চলে গেছেন। রোদ ঝিলমিল করছে চারিদিকে। কিন্তু বকুল একেবারে চুপচাপ! যা ছেলে

—চোখ মেলে অবস্থা বুঝতে পেরেছে, উচ্চবাচ্য না করে দেদার এই ফাঁকে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

মনোরমা দরজা খুলল। তুলে দিতে হবে এবার—খাবে, পড়তে বসবে, আর ঘুমুলে চলবে কেন?

কি ব্যাপার, শয্যায় তো নেই! পালাল কোথা দরজা-বন্ধ ঘর থেকে? বকুল করেছে কি—লুকিয়ে ছিল কবাটের আড়ালে, কাঁধে ঝোলানো সেই থলি। মনোরমা তক্তাপোশের নিচে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ে সে দে ছুট—

এ-ফুটপাথে জনার্দন হেঁকে চলেছেন, ও-ফুটপাথে তার প্রতিধ্বনি। এদিকে বুড়া, ওদিকে শিশু। পাল্লা চলেছে হাঁক পাড়বার। জনার্দন না দেখতে পান এমনি ভাবে বকুল এক-একবার তাকাচ্ছে এদিকে। জনার্দনও চুপিসারে তাকান। ভয়ানক বিবাদ চলেছে কি না—কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না। তাকিয়েও দেখবে না, কে কি করছে। ট্রাম-মোটর এসে পড়ছে তাদের মধ্যে, মাঝখানের পথের উপর। নজর সেই সময়টা আটকে যায়। গাড়ি চলে গিয়ে পথ খালি হয় আবার। প্রায় সমান তালে চলেছে, কেউ কারো পিছনে পড়ে না। অথচ, দেখ, ভারি ঝগড়া দু-জনের মধ্যে। কোন দিন যে পরিচয় ছিল, ভাব দেখে তা বুঝতে পারবে না।

পথ-চলতি মানুষ সকৌতুকে তাকাচ্ছে বকুলের দিকে। এমন কচি ছেলে ছবি বেচতে বেরিয়েছে। দুঃখও লাগে—নিতান্ত অভাবে পড়েই পথে বেরিয়েছে এইটুকু ছেলে।

দেখি খোকা, কি ছবি আছে তোমার—

পাঁজি-থেকে-কাটা ঘণ্টাকর্ণ-পূজার ছবি—দমাদম লাঠি পিটে ক-ভাই, পূজোপচার লণ্ডভণ্ড করছে...হাঁপানি-সংহারক রস—অস্থিসার লোকটির বুকে মলম মালিশ করছে...জনার্দনের দোকানের ছেঁড়া বাতিল ছবিও আছে দু-চারখানা।

লোকটি তারিফ করে, বাঃ—খাসা খাসা ছবি তো! নিচ্ছি আমি একখানা।

বকুল বলে, ছবি বাঁধাতেও পারি। বাঁধিয়ে দেবো?

লোকটি হেসে বলে, সে বুঝতে পেরেছি। সব পারো তুমি। কিন্তু এখন আমার সময় নেই। কিছু খেও এই দিয়ে—কেমন?

হাতে ক'টা পয়সা গুঁজে দিয়ে হনহনিয়ে লোকটা চলে গেল। তা বলেছে ভাল। সকালে কিছু খায় নি, ক্ষিধে পেয়েছে, খাওয়ার প্রয়োজন।

সওদার সময়টা জনার্দন দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ফুটপাথের উপর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকুলকে নয়—উপরের দিকে ট্রামের তার দেখছিলেন। এগোবেন কেমন করে—যদি সে পথ হারিয়ে ফেলে! এতদূর এসে পড়েছে, পথ চিনে বাড়ি ফেরা কি সহজ কথা?

লোকটা চলে গেলে জনার্দন বকুলের দিকে এগিয়ে এলেন। হাতের মুঠোয় পয়সা—বকুলের মন এখন ভারি খুশি। জনার্দনও তাতে বাতাস দিচ্ছেন।

ক্ষমতা আছে বটে ঠাকুরের! আমি পারলাম না, দাদা ভাই আমার কত রোজগার করে ফেলেছে!

গলিতে ঢুকবেন জনার্দন এবার।

দাদা ভাইয়ের আমার সঙ্গে তো ঝগড়া! ও পাতিকাক, শোন—তুমিই শোন তবে, আমি ডাইনে ঢুকছি। বড়-রাস্তায় চারতলা ছ'তলা বাড়ির উপর থেকে কেউ আমার গলা শুনতে পায় না। গলির মধ্যে চেঁচিয়ে দেখি। আমি তো বকু বাবু নই, অত কায়দা-কানুন জানি নে বাপু। উঃ, বকু বাবু কেমন সব ছবি বিক্রি করে, আমি পারিনে।

মোড় ঘুরে জনার্দন আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। বকুলের দৃক্‌পাত নেই তো! যেমন যাচ্ছিল, তেমনি চলেছে থপথপ করে গম্ভীর মুখে ব্যবসায়ের থলিটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে। জনার্দন আবার চিৎকার করেন।

শুনছ—ওহে থামওয়ালা বাড়ি, আমি এই ডাইনে ঘুরলাম। কেউ যদি হারিয়ে যায়, আমি কিন্তু জানি নে বাপু।

আবার খানিকটা গিয়ে পিছনে তাকান। দেখা নেই তো! জ্বালাতন, এই করে বেড়াবেন তো কাজ হবে কখন? রাস্তায় রাস্তায় দুই ছেলে-বুড়োয় লুকোচুরি খেলতে কি বেরিয়েছেন?

মনোযোগ দিয়ে হাঁক দিচ্ছেন এবার—খদ্দের চাই-ই। এরই মধ্যে নজর পড়ল...যাক, এতক্ষণে দেখা গেছে বাবুকে। দূরে—অনেক পিছনে। না এসে যাবে কোথায়? জনার্দন এক রোয়াকের কোণে বসে পড়লেন। যেন কষ্ট হয়েছে, জিরিয়ে নিচ্ছেন। বকুল এগিয়ে আসুক খানিকটা—অনেক পিছনে পড়েছে। এসেছে...চোরের মতো পা টিপে টিপে রোয়াকের ধারে এসে গেছে। কিচ্ছু টের পাচ্ছেন না জনার্দন—পাবেন কি করে, পিছনে তো চোখ নেই! মাথা টপকে সামনে এসে পড়ল মুড়ির একটা ঠোঙা। এই জন্য অদৃশ্য হয়েছিল সে—মুড়ি কিনছিল। মুড়ি ফেলেই বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো সাঁ করে সে ছুটে বেরুল। দুজনে বিষম ঝগড়া কিনা!

এমন পথে-ঘাটে বুড়ো মানুষের খাওয়া চলে কি? কিন্তু বকুল দিয়েছে যত্ন করে—সে তো যে-সে বস্তু নয়? এর চেয়ে পবিত্র সংসারের মধ্যে আর কি আছে? গঙ্গাজল খেতে দোষ নেই তো এতেও নেই।

রাত্রিবেলাও এই রকম মুড়ি হয়েছে। ক্ষিধেয় অবসন্ন হয়েছিলেন। বসবার কারণ শুধু বকুল নয়—এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে। মুড়ি খেয়ে রাস্তার কলে জল খেয়ে চাঙ্গা হলেন। হাঁক দিচ্ছেন, ছবি—ছবি—ছবি বাঁধাবেন—

ওদিকে আর কোন্ অদৃশ্য গলি থেকে শোনা যাচ্ছে, ছবি—

বিশালকায় এক গরু বকুলের গলিতে। বড্ড বেয়াড়া গরু তো—শিং উঁচিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে পিছু নিয়েছে। কেন, কি জন্যে? মুড়ি শুধু দাদুকে দেয়নি, তারও আছে—ঠোঙায় খেতে খেতে আসছিল, গরু কি তার ভাগ চায়? মুড়ি ছড়িয়ে দিল চাট্টি। গরুটা শুঁকছে, এই

ফাঁকে বকুল এগিয়ে গেছে অনেকটা। কি মুশকিল, মুড়ি না খেয়ে আবার যে পিছু ধরল! ছুটল এবারে বকুল।

দুই গলি এক জায়গায় মিশেছে চওড়া রাস্তায়। ছুটতে ছুটতে সে এসে পড়েছে জনার্দনের কাছে। অতি সন্তর্পণে তাঁকে স্পর্শ করে। আর কি, নির্ভয় এতক্ষণে! কোন-কিছুই গ্রাহ্য করে না সে এখন। গরুও চলে গেছে অন্যদিকে, দাদুকে দেখে পালিয়েছে। গরু যখন নেই, আবার খানিকটা দূরে দূরে চলতে বাধা কি?

অদৃষ্ট ভালো—এক বাড়ি থেকে আহ্বান এলো, এসো এই দিকে বুড়ো—

জনার্দন ঢুকলেন। ফটকের বাইরে থেকে বকুল উঁকিঝুঁকি দেয়।

ছবিটার কাচ ভেঙে গেছে, বাঁধিয়ে দিতে পারবে?

কেন পারব না? এই তো কাজ আমাদের—

ছবি হাতে নিয়ে দরদস্তুর করলেন। তারপর যন্ত্রপাতি নামিয়ে বসে পড়লেন সেখানে।

বকুলই বা কম কিসে? এদের দরদস্তুরের মধ্যে সে কেন অকারণ সময় নষ্ট করবে? খানিকটা দূরে এক বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচাচ্ছে, ছবি—

কেউ সাড়া দেয় না। বারম্বার হাঁক পাড়ছে, ছবি—ছবি—

বৈঠকখানা খোলা। বকুল ঢুকে পড়ল। পাশের কামরায় মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলে, ছবি বাঁধাবে?

ধমক দিয়ে উঠল একটা লোক, আচ্ছা উৎপাত তো!

লোক আর বলি কেন—আশুতোষ। জয়ন্তীর বাড়িতে আশুতোষ বছরের নিকাশ দিতে এসেছেন। বৈঠকখানায় এলেন তাকের উপর থেকে দোয়াত-কলম নিতে। বকুলকে দেখে অবাক হয়ে বলেন, এইটুকু ছেলে—তুই বাঁধাবি ছবি?

দিয়ে দেখ না—

যা, যা, ছবি নেই।

না থাকে, কেনো তবে আমার কাছে। দাদুর কাছে আরো সব ভালো ভালো ছবি আছে। ভালো করে বাঁধিয়ে দেবো। আমি না পারি, দাদু আসছে। তার মতো ছবির কাজ পিরথিমে কেউ পারে না।

আশুতোষ বলেন, হ্যাঁ—যা বাজার পড়েছে, মানুষ আবার ছবি কিনবে!

নাছোড়বান্দা বকুল বলে, তবে পুরানো ছবিই বাঁধিয়ে নাও।

মুখের দিকে চেয়ে অনুনয় করে, নাও গো—নাও—

সবই বাঁধানো আছে রে—

কাচ ভেঙেচুরে যায় তো অনেক! দেখ না—

যা-যা-যা। নেই। বোরো—বেরিয়ে যা বলছি।

দোয়াত নিয়ে আশুতোষ কাছারিঘরে চলে গেলেন।...

ঝনাৎ—

কি রে? দেখ তো, কি পড়ল ওদিকে?

দরোয়ান আর দু-তিনটে চাকর ছুটে এলো।

বাবুর বড় ছবিটা ভেঙেছে। বজ্জাত ছোঁড়া ভেঙে দিয়ে গেল। ধর্ ধর্—উই পালিয়ে যাচ্ছে—

নাগরা-জুতোর আওয়াজ পিছনে। বকুল প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। এঁকে বেঁকে এ-গলিতে ও-গলিতে ঢোকে।

জয়ন্তী বাইরে গিয়েছিল। বৈঠকখানায় পা দিয়ে স্তম্ভিত।

ছবি ভাঙল কে?

বাচ্চা একটা—

কে সে?

রাস্তা থেকে হঠাৎ এসে ঢুকে পড়েছিল।

জয়ন্তী গর্জন করে ওঠে, দরোয়ান করছিল কি? ঢুকতে দেয় কেন যাকে তাকে? খালি আড্ডা হয়েছে তোমাদের। দাঁড়াও, দলসুদ্ধ বিদেয় করছি—

ছবির কাচ ভেঙেছে, সে একটা ক্ষতি বটেই—আবার ছবিটা হল অমরেশের। জয়ন্তী রীতিমত শঙ্কিত অমরেশের সম্পর্কে। এমনি-তেই রাগারাগি চলছে, এর উপরে ছবিতে ইট পড়েছে টের পেলে রক্ষে থাকবে না। এটা জয়ন্তীদের কারসাজি, নিঃসন্দেহে সে বিশ্বাস করে বসবে। অবস্থা এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় কথায় সে ঝগড়া বাধায়।

তোমার খাই পরি কি না, তাই এত অপমান করতে সাহস করো—

আগে জয়ন্তী নিরুত্তরে সরে যেত। এখন সমান সমান জবাব দেয়।

তোমার খাই না, পরিও না—কিন্তু তুমি কি ছেড়ে কথা বলো? ড্রাইভারের কাছে পর্যন্ত খোঁজ নিয়েছ, গাড়িতে পুরুষ কেউ আমার সঙ্গে থাকে কি না।

আমায় সঙ্গে নিলে তো কথা ওঠে না—

তোমায় নিয়ে কোথায় যাবো?

তা তো বটেই! আমি যে খোঁড়া—

অন্ততপক্ষে এই অবধি জয়ন্তীর থেমে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেদিন কি হল—মন জলছে বনমালীর কাছে তত্ত্বতল্লাশ হয়েছে, খবরটা শোনা অবধি—সমান তেজে সে জবাব দিল, খোঁড়া সে কি মিথ্যে?

ব্যাপার সত্যি তাই। ঘর-সংসারে জয়ন্তীর বিরক্তি ধরে গেছে, যত-ক্ষণ পারে বাইরে বাইরে বেড়ায়। অমরেশকে সঙ্গে নেবে—তা ঠিকই ধরেছে অমরেশ—বান্ধবীদের সঙ্গে খোঁড়া স্বামীর পরিচয় করিয়ে দিতে লজ্জা করে বই কি! সে সব দিন আর নেই, স্বামীগর্বে ফেটে পড়ত সে যখন—কে আছে ভুবনে, রূপে গুণে বিদ্যায় অমরেশের পাশে দাঁড়াতে পারে? আর অমরেশও স্ত্রীকে পাগল হয়ে ভালবেসেছে, মর্যাদার অনেক উঁচু সিংহাসনে নিয়ে বসিয়েছে মনে মনে। সেই পরম সুখী দম্পতির আজকে এমন দশা, কেউ কাউকে সইতে পারে না। ভব্যতার আবরণ-টুকুও থাকে না সময় সময়।

আমি যে খোঁড়া—

জয়ন্তী বলে, খোঁড়া সেটা মিথ্যে নয়। আর বারবার শোনালেই নতুন একখানা পা বেরুবে না।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিঘূর্ণিত করে অমরেশ বলে, কিন্তু কে করেছে?

দৈব দুর্ঘটনা। সেই বিপাকে তোমার না হয়ে আমার পা-ও খোঁড়া হতে পারত। কিন্তু সে যা-ই হোক, আমি তো অপরাধ মেনে নিয়েছি—জীবন ভোর তার প্রায়শ্চিত্ত চলেছে।

অমরেশ বলে, সে জানি—আমার স্ত্রী হওয়া তুষানলে প্রায়শ্চিত্তের সমান। অনেক দিন তো হল—এবারে মুক্তি। থাকব না তোমার গলগ্রহ হয়ে—

অবিরত কলহ এবং অকারণ সন্দেহে জয়ন্তীও সহ্যের শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বলে, জুটল নাকি কোথাও কিছু?

জোটাবোই। পা একখানা আছে তবু—তারই উপর ভর দিয়ে দাঁড়াব।

জয়ন্তী বলে, আমিও তাই বলি—কোন একটা কাজে লেগে পড়া উচিত। যত গোলমাল কুঁড়ে হয়ে শুয়ে বসে থাকার জন্য। মামা এসেছেন—যাও না তাঁর সঙ্গে মহালে। সেখানে দিনকতক থেকে এসো।

অমরেশ বলে, তোমার এলাকা ছাড়াও পৃথিবীতে জায়গা আছে। ঢের ঢের নিয়েছি, আর তোমার দয়া নেবো না।

পরে শান্ত হয়ে জয়ন্তীর লজ্জার অবধি রইল না। অমরেশকে অনেক রকমে ভোলাবার চেষ্টা করেছে, মাপ চেয়েছে তার কাছে প্রকারান্তরে। ইদানীং তাদের মধ্যে সামান্যই কথাবার্তা হয়, অমরেশ প্রায় নির্বাক হয়ে থাকে। খুব কম সময় সে বাড়ি থাকে, পুরানো পরিচিতদের কাছে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়। প্রাণপাত চেষ্টা করছে চাকরির জন্য। জয়ন্তীর গাড়িও নেয় না, ক্রাচে ভর দিয়ে খুট খুট করে চলে। দূর বেশি হলে ট্রামে বাসে যায়।

শঙ্কান্বিত জয়ন্তীর কানে এলো, ছবি বাঁধাবেন?

জয়ন্তী বলে, ডাকো ছবিওয়ালাকে। শোন বুড়ো, ছবির কাচ লাগিয়ে দিতে হবে।

যে আজ্ঞে—

লেগে যাও তবে।

এত বড় কাচ সঙ্গে আনা যায় না মা। দোকানে আছে, সেইখানে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দেবো—

তাড়াতাড়ি কিন্তু, খুব জরুরি—

গাড়ি তখনো গ্যারেজে ওঠেনি। জয়ন্তী ড্রাইভারকে ডেকে বলে, ছবিটা পাড়ো বনমালী। কারিগরকেও তুলে নাও। দোকান থেকে কাচ লাগিয়ে নিয়ে এসো এক্ষুণি—

গাড়িতে উঠতে গিয়ে জনার্দন এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছেন। নিঃসংশয়ে জানেন, বকুল আশেপাশে আছে কোথাও লুকিয়ে। একবার ডাকলেন. বকু বাবু—

বনমালী তাড়া দেয়, যাবে তো চলো। নয় তো আর কোন দোকানে দিয়ে আসি।

বকুল কি একা-একা চলে গেছে বাড়িতে? চিনে যেতে পেরেছে? না গিয়ে থাকে তো ছবি দোকানে রেখে আবার এসে খোঁজাখুঁজি করতে হবে। জ্বালাতন, জ্বালাতন! ছেলেটার জ্বালায় এক তিল সোয়াস্তি নেই।

দরোয়ান ধরে ফেলেছে বকুলকে। চুল ধরে টানতে টানতে জয়ন্তীর কাছে নিয়ে এলো। অনেক ভুগিয়েছে হতভাগা—মুখের গালিতে বোধ হয় রাগ শোধ যায়নি। নাগরা-জুতো দিয়ে পিটেছে কিনা কে জানে? রক্ত ফুটে বেরিয়েছে পিঠের কয়েকটা জায়গায়।

জয়ন্তী বলে, ইট মেরেছ তুমি ছবিতে?

হুঁ—

কেন?

ভাণ্ডব বলে—

আশুতোষ রাগে গরগর করছেন। সময়ে সময়ে জয়ন্তী একেবারে পরমহংস হয়ে ওঠে—এমন কাটা-কাটা জবাব শুনেও দৃক্‌পাত নেই। যেন ভারি মজার কথা—আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাই শুনছে।

কোন্‌ দিক দিয়ে অমরেশ এসে পড়ল।

কে ছেলেটা?

আশুতোষ বলে, কি জানি—কোন্‌ লাটসাহেবের বেটা! ঢিল মেরে তোমার ছবি ভেঙেছে। তার উপরে বাক্যির বহর শোন।

কি আশ্চর্য, অমরেশও হাসে।

ঢিল ছবিতে মেরেছে, আমায় মারেনি তো! ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন মামা?

তার পর সে-ও আবার রসিয়ে রসিয়ে প্রশ্ন করে, আমার উপরে এত রাগ কেন খোকা? খোঁড়া ল্যাং-ল্যাং করো, ঢিল মেরে ছবি ভেঙে দাও—

বকুল সবিস্ময়ে বলে, তোমার 'পরে রাগ কেন হবে? ছবিতে মারলে ব্যথা লাগে না তো!

কিন্তু ছবির 'পরেই বা রাগ কিসের?

রাগ নয়—

থেমে রইল একটুখানি। আবার জোর দিয়ে বলে, ছবি মারে না, বকে না, কিচ্ছু না। ছবি আমার কি করেছে?

রাগ নয়, কি তবে বলো। বলতেই হবে খোকা—

এবার জয়ন্তীর মুখে সোজা তাকিয়ে বকুল বলল, ছবি বাঁধাও না কেন তোমরা? জানো, কালকে দাদু না খেয়ে আছে। মা-ও খায়নি—

জল টলটল করে উঠল একফোঁটা বালকের চোখে। কান্নাভরা কণ্ঠে সে বলল, কেউ চায় না ছবি বাঁধাতে। কেউ ছবি কেনে না। কত দুঃখ যে দাদুর কপালে—হায় ভগবান!

আশুতোষ বলেন, বুঝতে পারলাম, ঐ যে বুড়ো ছবি-ছবি করে হাঁক দিচ্ছিল—

আমার দাদু—

আর কোথায় যাবে, আশুতোষ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন।

শুনলে তো? বাচ্চা-বুড়োয় দল বেঁধেছে। বুড়োই লেলিয়ে দেয় বাচ্চাটাকে—দুটোকে একসঙ্গে থানায় পাঠাতে হবে।

অমরেশ তখন বকুলকে কাছে নিয়ে পিঠে হাত বুলাচ্ছিল। চোখ সজল হয়ে উঠেছে। আশুতোষের কথায় সে গর্জন করে ওঠে, থানায় আপনাদের পাঠানো উচিত। মনিব চাকর সবগুলোকে। দুষ্টুমি করে না হয় ক্ষতিই করেছে। তা বলে একটু দয়া-মায়া থাকবে না? উঃ, কশাই আপনারা—মুখ দেখলে পাপ হয়।

জয়ন্তী তখন ওদিকের দরজায় কুঞ্জ খানাসামাকে ডেকে কি নির্দেশ দিচ্ছিল। অমরেশের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। বোধ করি মুখ দেখবারই অনিচ্ছায় অমরেশ টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

খানিক পরে থমথমে ভাবটা একটু কেটেছে। বকুলকে কোলের কাছে বসিয়ে জয়ন্তী ঘাটিয়ে ঘাটিয়ে তার কথা শোনে। কুঞ্জ এসে বলল, খানা তৈয়ারি—

যাচ্ছি—

উঠে দাঁড়িয়ে বকুলের হাত ধরে জয়ন্তী বলে, চলো খোকা। খেতে খেতে গল্প হবে—কেমন?

বড় বড় ঝাকড়া চুলের বোঝা নেড়ে বকুল বলে, আমি যাই—

খেয়ে তারপর যাবে।

না, না—। আরও জোরে বকুল ঘাড় নাড়ে। আমি বাড়ি যাবো।

বাড়ির কথা মনে উঠতে ছেলে ব্যাকুল হয়েছে, খাঁচায়-পোরা পাখীর মতো ছটফট করছে। অসহায় চোখের চাউনি। খাওয়ানোর আগ্রহ ও টানাটানিতে আরো যেন ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্তী বলে, যাবে-যাবে বলছ, তা ঠিকানা জানো? কোন রাস্তায় তোমাদের বাড়ি?

বকুল ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

চিনে যেতে পারবে?

বকুল বলে, আমার ভয় করবে। মস্ত বড় তেঁতুল গাছ—সেই গাছে ভূত থাকে।

দু'পা এগিয়ে এসে এবারে সে-ই জয়ন্তীর হাত চেপে ধরে।

তুমি চলো—

জয়ন্তী বলে, আমি তো চিনিনে তোমাদের বাড়ি।

যে আশুতোষ এমন মারমুখি হয়েছিলেন, নিরুপায় শিশু তাঁর দিকে চেয়ে বলে, তুমি চেনো?

বিরক্ত আশুতোষ মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

বকুল আকুল স্বরে বলে, কে চেনে তা হলে বলো—

জয়ন্তী বলে, কেউ চেনে না খোকা। চিনবে কি করে? তুমি যে ঠিকানা বলতে পারছ না।

ঐ যে বললাম, তেঁতুল গাছ—খুব বড় বড় ডাল, একটা বাঁদর এসেছিল ঐ গাছে—তেঁতুল খেতো।

জয়ন্তী হেসে বলে, বড় ডালওয়ালা কত তেঁতুল গাছ আছে! শুধু গাছ বললে কি চেনা যায়?

বিরক্ত অধীর কণ্ঠে বকুল বলে, তোমরা বোকা—কিচ্ছু জানো না। তবে আমি একলাই যাবো। রাম-রাম করতে করতে যাবো, ভূতে কি করবে?

তখনই রওনা হয়ে যায়। জয়ন্তী বাধা দিয়ে বলে, একলা যেতে হবে না খোকা। গাড়িতে তোমার দাদুকে নিয়ে গেছে। ফিরে আসুক—আবার তোমায় পেঁাছে দিয়ে আসবে।

কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে বকুল বলে, কিসের গাড়ি?

মোটরগাড়ি। ঐ যে ভক-ভক করতে করতে দৌড়য়—

মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যাবে আমায়? কখন ফিরে আসবে মোটর-গাড়ি, কত দেরি?

বকুলের আর সবুর সইছে না। জয়ন্তী বলে, এক্ষুণি এসে যাবে। এই ফাঁকে একটু-কিছু খেয়ে নাও। এই, দুধ নিয়ে আয় খোকার জন্য, আর বিস্কুট ক'খানা—

ব্যাকুল হয়ে বকুল বলে, খাবো না আমি। তোমার মোটর আসুক —এসে তক্ষুণি আমায় রেখে আসবে।

খাবে না কেন খোকা?

পালিয়ে এসেছি। মা কত কাঁদছে! আমি না গেলে সে কিছু খাবে না।

যা কখনো হয় না—অলক্ষ্যে জয়ন্তী বুঝি আঁচলে একবার চক্ষু মার্জনা করল।

না খেলে মোটর চড়া হবে না কিন্তু। আমার কথা শুনছ না—গাড়িও চলবে না তা হলে।

গাড়ি চলবে না কেন?

বাঃ, তার বুঝি রাগ নেই? গাড়ি যেই শুনবে, তুমি খাওনি, কথা শোননি, গুম হয়ে পড়ে থাকবে এক জায়গায়। কেউ তাকে নড়াতে পারবে না।

অমনি করে নাকি?

করে না! তুমি যেমন—তোমার চেয়েও বেশি দুষ্টু মোটরগাড়িটা। তাই তো বলছি, লক্ষ্মীর মতো খেয়ে-দেয়ে নাও গাড়ি আসবার আগে। তাহলে সে-ও বেয়াড়াপনা করবে না।

ঢোক কয়েক দুধ খেয়েছে, এমন সময় আওয়াজ করে গাড়ি ফিরে এলো। আর বকুলকে খাওয়ায় কে? দুধ ফেলে সে ছুটল গাড়ির কাছে।

বনমালী বলে, অতি ছোট্ট দোকান মা, অত বড় কাচ কোথায় পাবে? কিনে এনে কালকের মধ্যে লাগিয়ে দেবে, বলছে। ছবি আমি ফিরিয়ে

আনছিলাম। তা বুড়োমানুষ এমন হাতে-পায়ে ধরতে লাগল—আমি তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

জয়ন্তী বলে, ছবি ওখানেই থাকবে। বরঞ্চ ক'টা টাকা দিয়ে এসো—কাচ-টাচ কিনবে তো? আর এই খোকাকে পৌঁছে দিয়ে এসো সেখানে।

টেবিলে পাশাপাশি তিনটে প্লেট পড়েছে। তিনখানা ধবধবে ন্যাপকিন ফুলের মতো গুটিয়ে রাখা। কুঞ্জ খানসামা সুপ এনে দিল একটা প্লেটের উপর।

জয়ন্তী প্রশ্ন করে, বাবু?

খাবেন না—অসুখ করেছে বললেন। রোহিণী দিদি ডাকতে গিয়েছিল—তাকে গালমন্দ করলেন।

তারপর কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করে, এক বাবালোক খাবে—বললেন যে?

সে-ও চলে গেল। কেউ নেই—আমি একা। আমার একলার মতন দাও কুঞ্জ।

অমরেশ চাকরি জুটিয়ে ফেলেছে কোথায়। বেশ তো, ভালই তো! এই চায় জয়ন্তী। কাজে লেগে থাকলে মন সুস্থ হবে তার। পরের সে গলগ্রহ নয়—এই আনন্দে সহজ মানুষ হয়ে উঠবে, শ্লথ দাম্পত্য-বন্ধন মধুর হবে আবার তাদের মধ্যে।

চাকরির খবর শুনেছে নিতান্তই এর তার মুখে। অমরেশ নিজে কিছু বলেনি। ক'টা কথাই বা বলে সে আজকাল! তা না-ই বলুক—জয়ন্তীর তাতে ক্ষোভ নেই। অমরেশ ভাল থাকলেই হল, অমরেশের উন্নতি হলে সে খুশি।

কিন্তু কি হল আজকে—ভোরবেলা সে বেরিয়ে গেছে, অফিসে কি কাজ আছে—ভারি জরুরি। সন্ধ্যা হয়ে আসে, এখনো দেখা নেই। নাওয়া-খাওয়ার সময় হয় না—কি এমন চাকরি রে বাপু? জয়ন্তীকে

যদি জিজ্ঞাসা করে, এক্ষুণি বলে দেবে ইস্তফা দিতে। দরকার নেই অমন চাকরি করবার। কিন্তু কে-ই বা জিজ্ঞাসা করছে আর কাকেই বা সে বলছে! এত বড় বাড়ির মধ্যে জয়ন্তী নিতান্ত একা। অমরেশের রাগ, কেন সে বাইরে বাইরে ঘোরে! কিন্তু কথার দোসর নেই—কি করে বাঁচে নিষ্প্রাণ নিঃসঙ্গ এই ইষ্টকপুরীর মধ্যে?

বড় বিশ্রী লাগছে। জয়ন্তী গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াল লক্ষ্য-হীনভাবে। তারপর গাছের তলায় এক নিরালা বেঞ্চির উপর বসে পড়ল। একটা-দুটো করে আকাশে তারা ফুটছে, দেখছে তাই তাকিয়ে তাকিয়ে। আছে বসে কতক্ষণ ধরে!

এমন চুপচাপ যে?

এক বান্ধবী, একসঙ্গে কলেজে পড়েছে। যেন বাঘের মুখোমুখি গিয়ে পড়েছে, এমনি আতঙ্কিত চেহারা জয়ন্তীর। কথার একটি জবাব দিল না। অভ্যাস মতো নমস্কার করল, এই মাত্র। কোথায় হয়তো নিয়ে যেতে চাইবে, অথবা কাছে বসে ওদের অভ্যস্ত যত সমস্ত বুলি কপচাবে—জয়ন্তীর সহ্য হবে না আজকে। অতি-দ্রুত গিয়ে সে গাড়ির দরজা খুলে পিছনের সিটে গড়িয়ে পড়ল। পালিয়ে গিয়ে যেন বাঁচল—জন-সঙ্গ এমনি বিরক্তিকর লাগছে।

বনমালীকে বলে, চলো—

কোথায় যাবো মা?

এই এক সমস্যা—এবারে তো বলতে হয় একটা-কিছু। নিজের হাতে ষ্টিয়ারিং নেই যে খেয়াল মতো গাড়ির মুখ ঘোরাবে।

সেই যে ছবি বাঁধাতে দিয়ে এলে, আর দেখা নেই। কদিন হ'ল বনমালী?

বনমালী মনে মনে একটু হিসাব করে বলে, দিন পাঁচ-ছয় হল বই কি! পরের দিন দিয়ে যাবে বলেছিল—তাই দেখুন। ওদের কোন কথায় ভরসা করা যায় না।

চলো সেখানে—

বনমালী বলে, আপনি যাবেন কি করে মা? পথ খুঁড়ে রেখেছে—গাড়ি রেখে অনেকখানি হাঁটতে হবে। খোয়া ঢেলে রেখেছে—তার উপর দিয়ে লোকজন যায়। সে আপনি পেরে উঠবেন না।

জয়ন্তী বলে, না গিয়ে উপায় কি? এক দিন বলে নিয়ে গিয়ে আর দিচ্ছে না। ছবি আমি আজকেই চাই।

একটু ম্লান হেসে বলে, দুর্বাসা ঠাকুরের ছবি, বাপরে বাপ! খোয়া গেলে রক্ষে থাকবে না।

গাড়ি রাখল এক গলির মোড়ে। বনমালী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গ্যাসপোষ্ট একটা এই এখানে একটা উই ওখানে খাড়া আছে ঠিকই—কিন্তু উপরের অংশ ভেঙে নিয়ে গেছে। আলো জ্বালা বন্ধ লড়াইয়ের সেই ব্লাকআউটের আমল থেকে। তার উপর সোনায় সোহাগা—বৃষ্টির জল জমে রয়েছে রাস্তায়। জলকাদা মেখে কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি হয়ে জয়ন্তী জনার্দনের দোকানঘরে এসে উঠল।

দোকান বন্ধের সময়। বুড়া ধূপকাঠি জেবলে দিচ্ছিলেন কুলুঙিগতে গণেশ-মূর্তির সামনে। জয়ন্তীকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠলেন।

অপরাধ হয়েছে মা-জননী। এমন কাচ আমরা রাখিনে—ছোট-খাটো দোকানে এত বড় কাজ কে দেবে? যেতে হল রাধাবাজার অবধি। আজকেই নিয়ে এসেছি এই দেখুন। এদ্দিন পেরে উঠি নি—নানান অসুখ-বিসুখ অশান্তি—এক বার গিয়ে খবর দিয়ে আসব, তা-ও পেরে উঠি নি। নিজে আপনাকে এই নরককুণ্ডে আসতে হল।

জয়ন্তী ব্যাপারটা লঘু করে নেয়।

তাতে কি হয়েছে? এদিক দিয়ে যাচ্ছি, তাই ঘুরে গেলাম। আর ক-দিন লাগবে?

এইবার হয়ে যাবে। কাচ যখন এসে গেছে, আর কতক্ষণ? কাল সকালে না পারি তো বিকাল বেলা ঠিক পৌঁছে দিয়ে আসব।

ছেঁড়া-মাদুরের প্রান্ত-ভাগে জয়ন্তী বসে পড়েছে। জনার্দন সংকুচিত হয়ে বলে, টুল এনে দিচ্ছি বাড়ি থেকে। একটু দাঁড়ান—

জয়ন্তী হেসে বলে, দাঁড়াতে পারছি নে কর্তা। অনেক পথ হেঁটে এলাম কি না! একটু বসেছি, তার জন্য অমন করছেন কেন?

মানে, ধুলোবালি...বসবার মতন জায়গা কি এটা?

ততক্ষণে জয়ন্তী মগ্ন হয়ে গেছে ছবির মধ্যে।

বাঃ, ভালো ভালো ছবি আপনার দোকানে! বিক্রির জন্যে তো? আমি বাছতে লাগলাম কিন্তু—

জনার্দন সলজ্জে বলেন, আপনাদের বড় ঘরে টাঙানোর মতো নয়। কাঁচা রঙের ছবি—দেশি পোটোরা এঁকেছে। মেলার মরশুমে কিছু-কিছু বিক্রি হয়। আমরাও দু-দশ খানা রেখে দিই—বেশি পয়সা দিয়ে ছবি কেনার লোক আমাদের কাছে আসে না তো!

জয়ন্তী বলে, খেতে না পেয়ে পোটোরা মরে গেল। রঙ-তুলি ছেড়ে লাঙল ধরেছে, মোট বইছে, ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। আর ভদ্র-সমাজের কত জনে নকল পোটো সেজে টাকা লুঠছে। সেই নকল পট কিনি আমরা হাজার হাজার টাকায়, দেয়ালে টাঙিয়ে দেমাক করি।

ছোট বড় নানা আকারের ছবি একদিকে—কতক আলগা, কতক বাঁধানো। খান কয়েক বাছাই করে জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করল, কি দামে বিক্রি করেন এগুলো?

দাম এক রকমের নয় মা। মালের রকমফের আছে—সেই অনুযায়ী দর। এইগুলো দু' আনা করে, আবার বড় হলে আট আনা অবধিও ওঠে।

জয়ন্তী বলে, দু'আনা আট-আনা করে কিনতে পারব না, সে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

জনার্দন তাড়াতাড়ি বলেন, তার জন্যে কি হয়েছে মা, আপনার সঙ্গে কথা কি! যা খুশি হয়ে দেবেন, আমি সোনা মুখ করে নেবো।

পাঁচ টাকা করে দেবো আমি—

বিস্ময়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে জনার্দন পুনরাবৃত্তি করেন, পাঁচ টাকা? সে-ও তো জলের দাম—

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ল, এমনিভাবে বলে, সেই যে ছেলেটা —আপনার নাতি হবে বোধ হয়—কি নাম ভালো?

বকুলের কথা বলছেন?

নাম বকুল? মজার নাম তো! বকুল আবার বেটাছেলের নাম হয়? ছেলেটা সেদিন পায়ের জুতো ফেলে এসেছে আমাদের বাড়ি।

ছেঁড়া স্যাণ্ডেল মা, তার আর কিছু ছিল না। পাকা রাস্তায় নিতান্ত খালি পায়ে হাঁটা যায় না, তালিতুলি দিয়ে কোন রকমে তাই পায়ে ঢুকাতো। একজোড়া জুতো এবার কিনে দিতে হবে—অনেক দিন থেকে বায়না ধরেছে।

আমি নিয়ে এসেছি তার জুতো—

সে কি কথা! ছেঁড়া জুতো বয়ে আনতে গেলেন কেন মা? ছবি দিতে যাচ্ছিই তো আমি—সেই সময় নিয়ে আসতাম।

বনমালী গাড়ি থেকে জুতা এনে দিল। চকচকে বার্ণিশ নতুন প্যাটার্নের জুতাজোড়া।

জয়ন্তী বলে, পায়ে হয় কিনা দেখে নিলে হত। পুরানো জুতোর মাপে কেনা অবিশ্যি। ছোট হলে বদল করে নিতে হবে। কোথায় বকুল?

বাড়ি আছে, জ্বর হয়েছে আজ ক'দিন।

পথ কোন দিকে?

ব্যস্ত হয়ে জয়ন্তী উঠে দাঁড়ায়। জনার্দন বাধা দিয়ে বলেন, আপনি কোথা যাবেন? আপনার যাবার মতন সে জায়গা নয়। আমি ডেকে তুলে আনছি। জ্বর হয়েছে তো কি হয়েছে!

এত বেশি জোরালো আপত্তি যে জয়ন্তী থমকে গেল। দারিদ্র্য ছাড়া আরো কিছু আছে হয়তো। সে যা-ই হোক, বাড়ির মালিক এমন করছেন, এ অবস্থায় যাওয়া চলে না। আজকে এই প্রথম দিনে তো নয়ই।

বসে রইল সে, জনার্দন সুঁড়িপথে ভিতরে চলে গেলেন। খানিক

পরে ফিরে এসে বলেন, বকুল ঘুমিয়ে পড়েছে—জ্বরটা বেড়েছে। জুতো ঠিক হবে, পায়ের উপর খাটিয়ে দেখলাম। কি আর বলব মা, জেগে উঠে কত আহ্লাদ করবে যে জুতো পেয়ে—

কিন্তু জয়ন্তী শুনছে না। বকুলের জ্বর বেড়েছে—তা-ও কানে গেল না বুঝি তার! থমথমে গম্ভীর মুখ। ছবি নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। বলে, পাঁচ খানা আছে ছবি—দাম হল পঁচিশ টাকা।

টাকা দিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে জয়ন্তী ঘরের দরজা বন্ধ করল। জানলারও কবাট এঁটে দিল, কোন দিক দিয়ে কেউ দেখতে না পায়। পটের মোড়কটা খুলল এবার। তার মধ্যে ফোটোগ্রাফ একটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছে। চোখে জল ভরে আসে—এ কি হল, জয়ন্তী হেন মেয়েরও চোখে জল! কেউ দেখতে পাচ্ছে না—এই যা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে। না, বন্ধ ঘরে দেখবে কি করে অন্য কেউ? মরে গেলেও জয়ন্তী লোকজনের সামনে কাঁদতে পারবে না।

অমরেশের ফোটো। একটি হাসিমুখ মেয়ে তার পাশে। দেখলে সন্দেহ থাকে না, স্বামি-স্ত্রী তারা। আবার বিয়ে করেছে অমরেশ? তা যে রকম জ্বালাতন হয়েছে জয়ন্তীর কাছে, যেমন অপমান পেয়েছে—সেটা কিছু অসম্ভব নয়। জীবনে সুখী হতে চাচ্ছে—হোক, তাই সে হোক। অতি-শৈশবে জয়ন্তী মা হারিয়েছে। বাবাও গেলেন। ঈশ্বর, ছেলেটাও যদি থাকত, সেই মাংসের দলাটা দিনে দিনে বড় করে মানুষের মূর্তিতে গড়ে তুলতে পারত যদি! একা থাকা তার ভাগ্যের লিখন, দোসর সে সইতেও পারে না। ঠিকই হয়েছে—তার পক্ষে সংসারের প্রত্যাশা করা অন্যায়।

উজ্জ্বল ফ্লোরেসেণ্ট আলোয় আয়নার সামনে দাঁড়াল। আর ঐ ফোটো ধরল পাশে। অমরেশের একদিকে সে, আর একদিকে চিত্রায়িত ঐ মেয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। টানা-টানা চোখ, হাসি-হাসি

ঠোঁট—সরল সুন্দর মুখখানা। সতীনের প্রতি ঈর্ষ্যা হওয়া উচিত, কিন্তু স্নেহে মন ভরে যাচ্ছে। অমরেশকে পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে, এমনি গর্ব আর আনন্দ ছবির মেয়ের মুখে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—পূর্ণিমার চাঁদের মতো নিটোল গোলাকার। জয়ন্তী এমন করে সিঁদুর পরেনি তো কখনো! তার সিঁদুর—সিঁথির ফাঁকে সূক্ষ্ম একটু রক্ত-রেখা, কালো চুলের বোঝায় তা ঢেকে থাকে। কুমারী পরিচয় দিলে অবিশ্বাস করতে পারবে না কেউ। আর দেখ না, এই বউটা যেন গলা ফাটিয়ে স্বামি-সৌভাগ্যের জাঁক করছে। অমরেশকেও কত তরুণ ও মাধুর্যময় দেখাচ্ছে ঐ মেয়েটার সঙ্গে!

বলবে কি অমরেশকে কিছু? না, কিছু নয়। কিছুই তার আসে যায় না, এমনি ভাব দেখাবে। কিন্তু রাত্রি এত হল, বাড়ি আসছে না সে কেন? রোহিণী, বনমালী, কুঞ্জ—সকলকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল —তারাও কিছু বলতে পারে না।

জয়ন্তী বলে, আমাদের দু-জনের খাবার ঘরে দিয়ে যাও—দিয়ে খাওগে তোমরা। আর কতক্ষণ বসে থাকবে? আমি জেগে আছি।

ঘুম আসে না, সমস্ত রাত্রি জেগে কাটাল।...আবার বিয়ে করে অমরেশ যুগলের ছবি বাঁধাতে দিয়ে গেছে ঐ দোকানে। ছবিটা চুরি করে আনা উচিত হয়নি জয়ন্তীর পক্ষে। এমন আত্ম-অবমাননা কেন সে করল অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে? ফেরত দিয়ে আসবে কোন একটা ছুতো করে —জনার্দনকে বলবে, পটের সঙ্গে মিশে ফোটোটাও চলে গিয়েছিল। কৌতূহল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবে কি, যারা ছবি বাঁধাতে দিয়েছে কোথায় তাদের ঠিকানা? ঘুরিয়ে এমন ভাবে প্রশ্ন করবে, বুড়ো কারিগর যাতে কিছু মনে করতে না পারে। সেটা এমন-কিছু কঠিন নয়। কিন্তু প্রশ্নটাই উচিত হবে কিনা? না—ফোটোখানা শুধু মাত্র ফেরত দিয়ে আসবে, একটা কথাও এ সম্পর্কে তার জানবার প্রয়োজন নেই।

রাতটুকু পোহালে আরও খানিক ইতস্তত করে গাড়ি নিয়ে বেরুল। ঘুরতে ঘুরতে এলো সেই স্তূপীকৃত খোয়ার জায়গাটায়। পথটুকু পার হয়ে ছবির দোকানে এলো। দোকান বন্ধ। বড় সকাল সকাল এসে পড়েছে বোধ হয়। পায়চারি করছে জয়ন্তী এদিকে ওদিকে। রাস্তা ও আশপাশের লোক তাকাচ্ছে, সুবেশা নারী জুতো খুটখুট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ হেন জায়গায়। এত লোকের দৃষ্টিবতী হয়ে বিষম অস্বস্তি লাগছে জয়ন্তীর।

এক জনে এগিয়ে এলো, কাউকে খুঁজছেন?

জয়ন্তী বলে, একটা ছবি বাঁধাতে দিয়ে গেছি। আজকে পাবার কথা।

লোকটা বলে, সকালবেলা আজকাল তো দোকান খোলে না, ফেরি করে। তার উপরে অসুখ-বিসুখ চলছে বাড়িতে। রাত দুপুরে কাল ডাক্তার এসেছিল। কতক্ষণ আপনি পথে পথে ঘুরবেন? দাঁড়ান একটু, বুড়োকে ডেকে দিই—

বাঁ-দিককার সেই সুঁড়িপথে লোকটা ঢুকে গেল। ডাক্তার এসেছিল বকুলের জন্য নিশ্চয়—তারই অসুখের কথা বলছিল। আজকে আর জয়ন্তী ছাড়বে না, সে-ও চলল লোকটার পিছু পিছু। কি অসুখ করেছে, কেমন আছে বকুল—একটি বার নিজের চোখে না দেখে চলে যাবে কেমন করে?

জনার্দনকে ডাকছে সেই লোকটা—

ভিতর থেকে জবাব আসে, ঘুমুচ্ছেন তিনি। সারা রাত্তির জাগতে হয়েছে কিনা ছেলেটাকে নিয়ে!

চমকে ওঠে জয়ন্তী। কে বলল কথা? মাথায় গোলমাল লেগে যায়। পাগলের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

চোখোচোখি অমরেশের সঙ্গে।

ব্যঙ্গ স্বরে বলল, এই অফিস বুঝি? বাঃ, চমৎকার! এদ্দিন দিনে দিনে চলছিল, এখন অফিস রাতে দিনে চলবে?

অমরেশ হতভম্ব। জয়ন্তী এখানে, এ যে স্বপ্নাতীত! কথা

বেরোয় না ক্ষণ কাল। তার পর দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সহজ কণ্ঠে বলে, খবর না পাঠানো অন্যায় হয়েছে সত্যি। কিন্তু হুঁশ ছিল না—যমে-মানুষে টানাটানির অবস্থা গেছে। আজকেই একবার যাবো মনে করেছিলাম—

কাঁথা চাপা-দেওয়া পাশের বস্তুটা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, না—তুমি যাবে না বাবা। কক্ষণো কোথাও যেতে পারবে না।

জয়ন্তীর এইবার নজর পড়ে। উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিল। এই বকুল—এমনি হয়ে গেছে এই ক'দিনে! দৃষ্টি তার অশ্রু-সজল হয়ে উঠল।

আ মরে যাই—অসুখ তোমার বকুল বাবু?

এখনো প্রবল জ্বর। হাঁসফাঁস করছে ছেলে। চোখ লাল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল জয়ন্তীকে। ক্লান্ত স্বরে বলে, জল খাবো—

পাথরের বাটিতে মৌরি-ভেজানো জল। বাটিটা তুলে অমরেশ একটুখানি জল গালে ঢেলে দেয়। হাত কেঁপে গিয়ে কষ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

জয়ন্তী বকে ওঠে, দিলে তো সৃষ্টিসুদ্ধ ভিজিয়ে? একেবারে আনাড়ি। সরো—সরে যাও দিকি। ঐ বালিশটা নিয়ে এসো।

ভিজে বালিশটা বদলে আর একটা অতি যত্নে মাথার নিচে গুঁজে দিল। শুকনো বটে, কিন্তু তেল-চিটচিটে—অবস্থা অতি শোচনীয়। বকুল তাকিয়ে আছে, সহসা দু-চোখ তার জলে ভরে যায়। বলে, আমার বাবাকে তুমি নিয়ে যাবার জন্য এসেছ?

অনেকক্ষণ জয়ন্তী জবাব দিতে পারে না, সামলে নিল অনেক চেষ্টায়।

এই যে সেদিন বললে বকুল বাবু, বাবা নেই তোমার—খালি মা আর দাদু? আমায় মিথ্যে করে বলেছিলে?

অমরেশের দিকে এক নজর চেয়ে আবার বলল, তা বেশ তো, থাকো তুমি বাবার কাছে। তোমার বাবাকে আমি নিয়ে যাবো কেন?

বকুল ঘুমিয়ে পড়লে অনেক বেলায় জয়ন্তী উঠল। আবার আসবে

বাড়ির ডাক্তারকে নিয়ে। অমরেশও চলল। অনেক কষ্ট গেছে, ছেলে এখন শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে—জয়ন্তী গায়ে হাত বুলিয়ে বাতাস করে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। বাড়ি গিয়ে অমরেশ বিশ্রাম নেবে কিছুক্ষণ।

গাড়ির মধ্যে দু-জনে পাশাপাশি। জয়ন্তী কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আতঙ্কে অমরেশ চোখ ফিরিয়ে নিল। বজ্রপাত হল বলে. প্রলয়ের আগেকার পরম নিঃশব্দতা।

সহসা দরদর-ধারায় অশ্রু নামল। ঝড়-ঝঞ্ঝা নয়, বৃষ্টির প্লাবন। এত কান্না জমানো ছিল দাম্ভিক মেয়েটার দুই চোখে!

অমরেশ মরমে মরে গিয়ে বলে, দোষ হয়েছে জয়ন্তী, আমায় মাপ করো। আগেকার সমস্ত কথা খুলে বলা উচিত ছিল।

জয়ন্তী বলে, ইচ্ছে করে বলো নি। আমার স্বামী—নিজেকে সঁপে দিয়েছি তোমার কাছে। এ কি একটা সামান্য কথা—কেন বললে না যে সংসার আছে, ছেলে আছে আমাদের? খোকার বাপ তুমি, আর চক্রান্ত করে আমায় মা হতে দাও নি। যা খুশি করে এসেছ ছেলে নিয়ে। এক-গা ধুলো মেখে ছেঁড়া চটি পায়ে সোনার পুতুল রাস্তায় রাস্তায় ছবি বেচে বেড়ায়, অসুখ হয়ে ভিজে মেজেয় পড়ে থাকে—অষুধ-পথ্যি জোটে না। দেখ, আমার উপর যা খুশি অত্যাচার করো গে—ছেলের হেনস্থা আমি কিছুতে সইব না।

অমরেশ মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি রাগ করবে জয়ন্তী, তাই এ সব কিছু বলতে পারি নি।

ঐ রাগটাই জেনে এসেছ শুধু। ছোট্টবেলা মা মরে গেল, কে আমায় কবে ভাল হতে শিখিয়েছে? হবোই তো বদরাগি, বেহায়া—মানুষের যত দোষ তোমরা ভাবতে পারো। তুমি ছাড়া কে আছে আমার—তুমিই কি ভাল কথায় বুঝিয়েছ কোন দিন, তেমন করে দুটো তাড়া দিয়েছ? দোষগুলোই কেবল মনে মনে গিঁঠ দিয়ে দূরে দূরে রইলে।

আকুল কান্নায় সে ভেঙে পড়ল স্বামীর কোলের উপর।

অমরেশকে বাড়ি পেঁাছে ডাক্তার নিয়ে জয়ন্তী প্রায় তখনই ফিরল। আধ-অন্ধকার ঘরে পা দিয়েই ডাক্তার শিউরে উঠলেন।

সকলের আগে রোগি সরানো হোক এই জায়গা থেকে। তার পরে চিকিৎসা। হাসপাতালে পাঠাতে চান তো ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

মনোরমা বলে, হাসপাতালের কাণ্ড জানা আছে ডাক্তারবাবু। কিচ্ছু দেখে না, ফেলে রেখে দেয়—

আরও অনেক কথা বলতে যাচ্ছিল। জয়ন্তী থামিয়ে দিয়ে অধীর কণ্ঠে বলে, সে-কথা উঠছেই বা কিসে? ছেলে হাসপাতালে দেবো তো অত বড় বাড়ি আগলে আছি কি জন্যে? আপনাকে নিয়ে এলাম ডাক্তার-বাবু, ভাল করে দেখুন—এ অবস্থায় নাড়াচাড়া চলবে কি না? পরামর্শ দিন, কি ভাবে বাড়িতে ছেলে নিয়ে তুলবো।

তাই হল। জয়ন্তীর বাড়িতে আছে বকুল—সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে। শিয়রের দু-পাশে দু-জন—মনোরমা আর জয়ন্তী। তা যে পালা করে বসবে, সে হবার জো নেই। কেউ নড়বে না শিয়র থেকে।

দিন সাতেক পরে সকালবেলা জানলা দিয়ে প্রসন্ন রোদ এসে পড়েছে। ছেলের জ্বর নেই, সকলের মনে স্ফূর্তি। জয়ন্তী স্নানের ঘরে গেছে। মনোরমাকে একলা পেয়ে বকুল চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করে, বলেছে কি জানিস? ও নাকি আমার মা—

হ্যাঁ।

যাঃ—। বকুল ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। তার পর রাগ করে ওঠে, মিথ্যে বলবিনে তুই। মিথ্যে বললে ঠাকুর রাগ করেন। তুই তো মা আমার—

না রে বকুল, আমি হলাম মাসি—

বকুল মাথা নেড়ে জেদ ধরে বলে, তুই আমার মা। মাসি তুই কেন হতে যাবি? মাসি হবে তো ও-ই হোক না?

বলে নিশ্চিন্ত আরামে সে ছোট্ট মাথাটা মনোরমার কোলের উপর তুলে দিল।

মনোরমা বলে, আমাদের বাসায় কত কষ্ট! মায়ের ছেলে হয়ে এখানে কত আরাম করে থাকতে পাবি। খাবি-পরবি ভালো, মোটর চড়ে বেড়াবি। আমি আর তোর দাদু মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো।

বকুল বলে, না মা, তা হবে না। আমি কাঁদব তা হলে—কক্ষণো এখানে থাকব না, মোটর চড়ব না। দাদুর সঙ্গে আমি দোকান করব।

স্নান করে জয়ন্তী কখন পিছনে এসেছে, কেউ এরা টের পায় নি। জয়ন্তী বলে উঠল, আমি যে কাঁদব বকুল বাবু, তুমি চলে গেলে। একা-একা আমি কেমন করে থাকবো?

বলতে বলতে সত্যিই চোখে জল এসে গেল। এ তার কি হয়েছে, কথায় কথায় কান্না!

বকুল একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে। তার পর শীর্ণ কম্পমান হাত তুলে ধীরে ধীরে চোখ মুছিয়ে দেয়।

না, কাঁদবিনে তুই অমন করে—

জো পেয়ে জয়ন্তী এবার জেদ করল, কাঁদবোই। তুই যদি চলে যাস বকুল, রাতদিন আমি পড়ে পড়ে কাঁদবো।

বকুল বলে, আমি তা হলে পড়বো না, খাবো না, রাস্তায় রাস্তায় বেড়াবো, কাচ ভাঙবো—

জয়ন্তীও ঠিক তেমনি সুরে বলে, আমি কাঁদবো,—কেঁদে কেঁদে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, তার পর মরে যাবো—

মরার কথায় বকুল ভয় পেয়েছে। মরা সে দেখেছে একবার বাসার পাশে। বড় ভয়ানক। কেউ যেন না মরে কখনো!

ভয়ে ভয়ে বলে, একেবারে মরে যাবি? কথা বলবি নে?

কথা বলব না, নড়ব না, বেড়াব না। কাঁদতে কাঁদতে 'হরিবোল' বলে সবাই নিয়ে যাবে।

মনোরমার দিকে চেয়ে বিব্রত ভাবে বকুল বলল, তুই মা তবে এইখানে

এসে থাক্। চলে গেলে এই মা যে মরে যাবে! ভারি দুষ্টু কি না—তোর মতন ভাল নয়।

জয়ন্তী সজল চোখে হেসে বলে, ছেলে কি বলে শুনলে তো ভাই? তাই এসো চলে। আমার একলা বাড়ি আনন্দ-নিকেতন হয়ে উঠুক।

আবার বলে, মামীদেরও নিয়ে আসতে হবে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বকুল খেলবে। নইলে মজা জমবে না।

মনোজ বসুর অন্যান্য বই

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (২য় সং)
জলজঙ্গল (২য় সং)
নবীন যাত্রা (২য় সং)
কুঙ্কুম
খদ্যোত
বাঁশের কেল্লা (২য় সং)
উলু (২য় সং)
কাচের আকাশ
রাখিবন্ধন
বিপর্যয়
আগস্ট ১৯৪২ (৩য় সং)
ভুলি নাই (২২শ সং)
শত্রুপক্ষের মেয়ে (৩য় সং)
সৈনিক (৬ষ্ঠ সং)
ওগো বধূসুন্দরী (৩য় সং)
নরবাঁধ (৪র্থ সং)
বনমর্ম্মর (৪র্থ সং)
একদা নিশীথকালে (৪র্থ সং)
পৃথিবী কাদের (৩য় সং)
দেবী কিশোরী (২য় সং)
দুঃখ নিশার শেষে (৩য় সং)
নূতন প্রভাত (৪র্থ সং)
প্লাবন (৪র্থ সং)
যুগান্তর (২য় সং)
দিল্লী অনেক দূর